প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের (কর্মরত)
ডি. এল. এড. কোর্স (২ বছর)
(দূরশিক্ষা মাধ্যম)

Understanding Children in Inclusive Context

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবন
ডি. কে. - ৭/১, সেক্টর - ২, সল্টলেক
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৪

Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the President, West Bengal Board of Primary Education.

প্রকাশক
অধ্যাপক ড: মানিক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবন
ডি. কে. - ৭/১, সেক্টর - ২,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Prelude

It gives us immense pleasure to announce that a Two-year D.El.Ed Course, ODL Mode (approved by N.C.T.E) is about to commence as a result of the collaborative efforts of the WBBPE with the Govt. of West Bengal in the School Education Deptt. after having overcome all the obstacles. This is going to solve the problems of the existing in-service untrained Primary Teachers of our state in the context of N.C.F. - 2005, N.C.F.T.E.-2009 and RTE Act-2009 as well. It has been decided that this two year teacher-training course will be conducted in the Open Distance Learning Mode under the aegis of the West Bengal Board of Primary Education for the next three years. Following the order of the School Education Department, W.B., a team of experts comprising eminent educationists, representatives of N.C.T.E and IGNOU has very sincerely prepared the syllabus, study materials, guide books for the trainees and the Coordinators and Counsellors of the 2 year D.El.Ed Course (ODL Mode) under the supervision of WBBPE. The curriculum and Syllabus of the core papers, four method papers with one compulsory optional paper out of two and four practical papers have been framed. Separate year wise study materials have been prepared for each paper and approved by NCTE.

The WBBPE will be glad if these study materials and guide books, which have been developed following the norms of the Open Distance Learning Mode, prove to be fruitful.

The WBBPE welcomes constructive suggestions and feedback for the improvement of these publications. The West Bengal Board of Primary Education would also like to convey sincere gratitude to all the eminent academicians from the NIOS, NCTE, IGNOU, SCERT, West Bengal DIETs, PTTIs and the Syllabus Committee and all others involved in the process of composition, editing and publication of these books.

December, 2012

President
West Bengal Board of Primary Education

আমাদের কথা

জাতীয় পাঠক্রমের রুপরেখা - ২০০৫, জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা শিক্ষক শিক্ষণ ২০০৯ শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামুলক শিক্ষার অধিকার আইন - ২০০৯ এর প্রাসঙ্গিক ধারা উপধারা মাথায় রেখে আমাদের ২ বছরের দূর শিক্ষার মাধ্যমে ডি. এল. এড. কোর্সের পাঠক্রম, পাঠ্যবিষয় ও আনুষঙ্গিক বিষয় ও রুপরেখা স্থির করা হয়েছে। এই তিনটি আবশ্যক বিষয় যাতে শিক্ষক শিক্ষিকাগণের ধারণা, কার্য্যপ্রণালী ও চিন্তনের মধ্যে আসে, আমাদের বর্তমান কোর্সের মূল উদ্দেশ্য সেটাই। RTE Act বা শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে সব শিক্ষকের স্পষ্ট ধারনা থাকা প্রয়োজন। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক যে প্রণালীতে বা পদ্ধতিতে বিষয় উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন, তাতে তাঁকে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, জিজ্ঞাসাকে সঙ্গী করে নিয়ে তিনি পাঠে অগ্রসর হচ্ছেন। শ্রেনি পাঠনের বেশ কিছু সময় যেন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যয় করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিষয় জানবার অধিকার আছে। মনে রাখা দরকার পঠন-পাঠন হবে শিক্ষার্থী বান্ধব এবং শিশু কেন্দ্রিক। অনুসৃত হবে কর্মভিত্তিক, আবিস্কার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া। শিশুকে সমস্ত রকম মানসিক ভীতি ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশে সাহায্য করতে হবে। শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর ২৯নং ধারার আটটি উপধারা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মুল্যায়ণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানের উপলব্ধি ও প্রয়োগ ক্ষমতার নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণ করতে হবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনার নতুন ভূমিকার কথা আপনি মনে রাখবেন-এই অনুরোধ।

আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সফল হবেই।

ডিসেম্বর, ২০১২

অধ্যাপক ডঃ মানিক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
পশ্চিম বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

Preface for the Second Edition

Modules of Two Year D. El. Ed Course were first prepared in the year 2012 for the teachers' training of in-service Primary Teachers of West Bengal through ODL mode. The modules were very much popular to its clienteles and were effective in imparting training. In the mean time the curricula of Primary Education and of regular Two Year D. El. Ed. have been changed. With a view to incorporate those changes in the Primary Teachers' Training the content and style of presentation have also been changed in the modules of Two Year D. El. Ed. (ODL) Course for the next session. Hope this module would enjoy more support from its clienteles. Any suggestion for the improvement of this module will be thankfully received.

With best wishes to all,

Prof.(Dr.) Manik Bhattacharya
President
WBBPE

December, 2014.

বিষয় সূচী

পাঠ একক - ১ ঃ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রাথমিক ধারণা

পাঠ একক - ২ ঃ শিখন প্রক্রিয়া ও শিখনের অর্থবোধ

পাঠ একক - ৩ ঃ সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন ও শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন

পাঠ একক - ৪ ঃ বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন কৌশল

পাঠ একক - ৫ ঃ PWD Act, 1995 প্রাথমিক স্তরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা

পাঠ একক - ৬ ঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ও সংগতিবিধান

পাঠ একক - ৭ ঃ যোগাযোগ ও শিশুর যোগাযোগ প্রক্রিয়া

পাঠ একক - ৮ ঃ প্রক্রিয়াগতভাবে শিক্ষা-শিখণের দক্ষতার উন্নয়ণের পরিকল্পনা — প্রি-ইনটার্নশিপ এবং ইনটার্নশিপ

পাঠ একক —১

(Understanding Child Growth and Development)

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রাথমিক ধারণা

গঠন (Structure)

১.১. সূচনা

১.২. উদ্দেশ্য

১.৩. জীবন বিকাশে বৃদ্ধি ও বিকাশ

১.৪. প্রত্যক্ষণের বিকাশ

১.৫. দৈহিক ও অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ

১.৬. বৌদ্ধিক বিকাশ

১.৭. ভাষার বিকাশ

১.৮. প্রাক্ষোভিক বিকাশ

১.৯. সামাজিক বিকাশ

১.১০. সারসংক্ষেপ

১.১১. অনুশীলনী

১.১২. উত্তর সংকেত

পাঠ একক - ১

১.১. সূচনা (Introduction)

আধুনিক যুগে শিক্ষা প্রক্রিয়া কতকগুলি স্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই স্তরগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক স্তর। স্তর আলোচনা, সমালোচনা, নানা ধরনের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও এখনও আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। প্রাথমিক শিক্ষা আজও সমস্যা জর্জরিত। এই সমস্যা সমাধানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশুর বিকাশ যদি এগিয়ে চলে তাহলে শিক্ষার্থীর সুষম বিকল্প প্রক্রিয়া সম্ভব। তাই এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রক্রিয়ার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সম্পর্কে জানতে পারব।

১.২.উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করতে পারবেন।
- বৃদ্ধি ও বিকাশের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষণের বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দৈহিক ও অঙ্গ সঞ্চালনমূলক বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৌদ্ধিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।
- প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির আলোচনা করতে পারবেন।

১.৩. জীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঃ (Growth and Development)

একটি ব্যক্তির সুষ্টু বিকাশের উপর তার ভবিষ্যত জীবন নির্ভর করে থাকে। আর এক্ষেত্রে শৈশব আবহাওয়া হল এমন একটি ভিত্তিস্তর যার উপর ব্যক্তির বিকাশ নির্ভর করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশুর বিকাশ যদি এগিয়ে চলে, তাহলে সেই বিকাশ হবে সুষম বিকাশ। কারণ শিক্ষা হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ। শিশুর সুষম বিকাশ প্রক্রিয়া নির্ভর করে দুটি শর্তের উপর যথা (i) বৃদ্ধি (Growth) (ii) বিকাশ (Development)।

১.৩.১ বৃদ্ধি (Growth)

বৃদ্ধি বলতে সাধারণভাবে আমরা দৈহিক আচরণগত পরিবর্তনকে বুঝি। অর্থাৎ এই অর্থে বৃদ্ধি এক ধরণের জৈবিক পরিণমন কারণ জীবনের ধর্ম হচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। মনোবিদ্রা বৃদ্ধি বলতে শুধুমাত্র আকার ও আয়তনের পরিবর্তন বোঝায়। আবার এই বৃদ্ধির ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। যদি ও এই পরিবর্তন ঘটে প্রাণীর আপন বৈশিস্টের দ্বারা যা প্রাণী পেয়ে থাকে নিজের পূর্বপুরুষের কাছ ক্ষেত্রে। সুতরাং বৃদ্ধি বলতে বোঝায় বিকাশের ক্ষমতা। অতএব বৃদ্ধি হল একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে শিশু বিকশিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া। আর এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিশুর সম্মিলিত প্রচেষ্টা হল বৃদ্ধি।

বৃদ্ধির কতকগুলি শর্ত আছে সেগুলি নিম্নরূপে ঃ

১) **অপরিনত অবস্থা ঃ-** শিশু অপরিনত অবস্থায় থাকে বলেই সে বিকশিত হতে পারে।

২) **নমনীয়তা ঃ-** পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজস্ব আচরণধারাকে পরিবর্তিত করার প্রক্রিয়া।

৩) **অভিযোজন ক্ষমতা ঃ-** ব্যক্তির অন্ত:জীবন ও বর্হিজীবনের নানা উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরই বৃদ্ধি নির্ভরশীল। বৃদ্ধি নির্ভর করে অনেক উপাদানের যথাযথ ক্রিয়ার বা অভিযোজন ক্ষমতার উপর।

৪) **ক্রমবৃদ্ধি ঃ-** ধীরে ধীরে অথচ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে বৃদ্ধি। ক্রমবৃদ্ধি ও প্রতিটি স্তর আগেকার স্তরের উপর নির্ভরশীল। ক্রমবৃদ্ধি এবং শিক্ষা আসে পরিবেশ ও ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য ঃ- বৃদ্ধির শর্তগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা বৃদ্ধির কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যকরি, সেই বৈশিষ্ট্য গুলি ছকের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

বৃ → দৈহিক বিকাশ

দ্ধি → বিকাশ প্রক্রিয়া

র → ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া

বৈ → সময়ের সঙ্গেঁ সম্পর্কিত

শি → বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে

ষ্ট্য → বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য

১) দৈহিক বিকাশ ঃ- দৈহিক বিকাশবলতে ব্যক্তির আয়তন বৃদ্ধি, দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি এবং হাত, পা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি বোঝান হয়। অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেহ কাঠামোর সার্বিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় উন্নত স্তরে বিচরন করে।

২) বিকাশ প্রক্রিয়া ঃ- বৃদ্ধির গুনগতদিককে আমরা বিকাশ প্রক্রিয়া বলে গন্য করি। বৃদ্ধির গুনগত প্রকাশ আচরন ধারার পরিবর্তনে লক্ষ্য করা যায়।

৩) ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া ঃ- বৃদ্ধির ফলে যে গুনগত ও পরিমানগত পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনের পর্যায়গুলি কখনো এলোমেলো ভাবে সম্পাদিত হয় না। ক্রম উন্নয়নশীল পরিবর্তনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সুতরাং বৃদ্ধি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া যার একটি নির্দিষ্ট হার আছে এবং ক্রম আছে।

৪) সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ঃ- বৃদ্ধি কথাটির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কালের সম্পর্ক বর্তমান। অর্থাৎ বৃদ্ধি হল পরিমাণগত পরিবর্তন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে তা বৃদ্ধির মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হয়।

৫) বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে ঃ- বৃদ্ধি যেমন নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় তেমনি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ পরিণমন পর্যায়ে এসে গেলে বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে।

৬)	বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য ঃ- বৃদ্ধি সর্বদাই পরিমাপ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃদ্ধির যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব।

**১.৩.২	বিকাশ (Development) ঃ-** বিকাশ বলতে আমরা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির গুনগত পরিবর্তনকে বুঝি। বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই দুইটি শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে একই প্রক্রিয়াকে বোঝালেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে এই দুটি প্রক্রিয়া পৃথকরুপে গন্য করা হয়। বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন। হারলক (Hurlock) বলেছেন-বিকাশ হল সারা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে পরিণমন ও অভিজ্ঞতা যুক্ত থাকে। সুতরাং বিকাশ হল ব্যক্তির জীবনব্যাপী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যার শুরু হয় সর্বপ্রথম মাতৃগর্ভে এবং তার সমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর সঙ্গে। তাই বিকাশকে আমরা দ্বিমুখী প্রক্রিয়ারুপে গন্য করে থাকি। তার একদিকে থাকে ব্যক্তিজীবনে বিকাশ সাধন অপরদিকে সমাজ জীবনে কল্যান সাধন।

ব্যাক্তিজীবনের বিকাশ সাধন ঃ- বিকাশের দ্বারা ব্যক্তিজীবনে কতগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যার মাধ্যমে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী নির্দিষ্ট ক্রম অনুয়ায়ী পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে সম্ভব হয়। আবার বিকাশের দ্বারা ব্যক্তি আন্তরিক চাহিদা ও প্রবনতাগুলি তৃপ্ত করে এবং আকাঙ্খিত দিকে বিকাশ লাভ করে।

সমাজ জীবনে কল্যান ঃ- বিকাশ প্রত্যেক ব্যাক্তির জীবনে এমন এক গতিধর্মিতার সন্ধান করে যার প্রভাবে ব্যক্তিমানসে সামাজিক চেতনার সঞ্চার ঘটিয়ে আনুপাতিক সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। অবশেষে শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে আদর্শ স্থির করে তার অভিমুখী গতি সঞ্চার করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যক্তির জীবনে এমন এক গতি ধর্মিতার সঞ্চার করে, যার প্রভাবে সে কল্যানমুখী অগ্রগতি অর্জন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ প্রক্রিয়ার কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি ঃ

বি ঃ- আচরনগত পরিবর্তন

কা ঃ- ব্যক্তিত্বের গুনগত পূর্ণবিকাশ

শে ঃ- সুষম বিকাশ

র ঃ- সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন

বৈ ঃ- সার্থক অভিযোজন এবং অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি

শি ঃ- পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল

ষ্ট্য ঃ- জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

১)	**আচরণগত পরিবর্তন ঃ-** বিকাশের ফলে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনে ব্যক্তির আচরণের নৈপুন্য বৃদ্ধি ঘটে।

২)	**ব্যাক্তিত্বের গুনগত পূর্ণ বিকাশ ঃ-** বিকাশের মধ্যে আত্মশক্তি এবং ব্যক্তিত্বের গুনগত পুর্ণ বিকাশ ঘটে।

৩)	**সুষম বিকাশ ঃ-** বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে সুষম বিকাশ ঘটে। সুষম বিকাশ বলতে ব্যক্তিজীবনের সকল সম্ভাবনার পরিমানগত ও গুনগত বিকাশ ঘটিয়ে পরিপুর্ণ জীবনের অধিকারী করে তোলা।

৪) **সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন ঃ-** বিকাশের ফলে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন ঘটে। সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, জ্ঞানমুলক, কৃষ্টি মুলক, ইত্যাদির বিকাশ যার মাধ্যমে শিশুর সবদিকে বিকাশ হয়ে থাকে।

৫) **সুবিন্যস্ত ক্রম অনুসরণ ঃ-** বিকাশের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সংগঠিত হয় এবং সর্বদাই সুবিন্যস্ত ক্রম অনুসরণ করে। প্রতিটি পরিবর্তন হল শিশুর পূর্বের বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফল।

৬) **সার্থক অভিযোজন ঃ-** বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন- এর দ্বারা ব্যক্তি জীবনে অভিযোজন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

৭) **পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল ঃ-** বিকাশ হল পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। তাই বিকাশকে ব্যক্তি ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার উৎপাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৮) **জীবনব্যাপী প্রতিক্রিয়া ঃ-** বিকাশ জীবনব্যাপি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার শুরু হয় শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকে, তা চলে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত।

১.৩.২.২. বিকাশের বিভিন্ন স্তর ঃ

বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুশীলন করে বিভিন্ন মনোবিদ জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করেছেন। যেমন-শিক্ষাবিদ রুশো (Rousseau)-র মতে জীবনবিকাশের স্তরগুলি হল ঃ

(১) শৈশব	ঃ	১ থেকে ৫ বছর
(২) বাল্যকাল	ঃ	৫ থেকে ১২ বছর
(৩) প্রাক বয়ঃ:সন্ধি	ঃ	১২ থেকে ১৫ বছর
(৪) বয়ঃসন্ধি	ঃ	১৫ থেকে ২০ বছর।

সুতরাং বিকাশস্তরটি আরোও বিস্তারিতভাবে ভাগ করলে আমরা বলতে পারি -

(১) শৈশবকাল ঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত।
(২) প্রারম্ভিক বাল্যকাল ঃ শৈশবের পরবর্তী ৬ বছর বয়স পর্যন্ত।
(৩) প্রান্তীয় বাল্যকাল ঃ ৮ থেকে ১১ বছরের শিশুদের জীবনকাল।
(৪) কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল ঃ সাধারণত ১১ থেকে ১৮ বছরের বয়সকাল।
(৫) বয়ঃপ্রাপ্তি ঃ সাধারণ ১৮ বছর বয়সের পরবর্তী স্তর।

এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই স্তরগুলির মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলিকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত কয়েকটি ভাগ করে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যের আলোচনা করেছেন। কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)-এর মত অনুযায়ী শিক্ষারস্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রাক-প্রাথমিক স্তর ঃ ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত।

(২) প্রাথমিক-স্তর ঃ ৬ বছর থেকে ১১ বছর পর্যন্ত (নিম্ন প্রাথমিক স্তর) এবং ১১ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত (উচ্চ প্রাথমিক স্তর)।

(৩) মাধ্যমিক স্তর ঃ ১৪ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সের স্তর।

(৪) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর ঃ ১৬ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত।

(৫) উচ্চশিক্ষা ঃ ১৮ বছর থেকে ২১ বছর বয়সের স্তরকে সাধারণত উচ্চশিক্ষা স্তর বলে গণ্য করা হয়।

সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে জীবনবিকাশের প্রতিটি স্তর সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যগুলিকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্মত।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করা। এর অন্তর্গত হল-

- দৈহিক বা অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ
- বৌদ্ধিক বিকাশ
- ভাষা বিকাশ
- প্রাক্ষোভিক বিকাশ
- সামাজিক বিকাশ

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন (Check your progress)

১. বৃদ্ধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের নাম উল্লেখ করুন ।

____

২. বিকাশ হল ব্যক্তির জীবনব্যাপী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া- বলতে কী বোঝেন?

____

৩. প্রত্যক্ষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা জীবন বিকাশের কতকগুলি স্তরের পরিচয় পাই, সেগুলি কী কী?

____

১.৩.৩ বৃদ্ধি ও বিকাশের সম্পর্ক ঃ- বৃদ্ধি ও বিকাশ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। বৃদ্ধি ছাড়া বিকাশ সম্ভব নয়। বৃদ্ধি হল দৈহিক আকার আকৃতির সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন। কিন্তু বিকাশ বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবে মানুষের সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করে। বৃদ্ধি ব্যক্তির অভ্যন্তরীন ব্যাপার ঠিকই তেমনি বিকাশ ও ব্যক্তির অভ্যন্তরীন ব্যাপার। অর্থাৎ ব্যক্তির শারীরিক, দৈহিক সামাজিক, আবেগমূলক প্রভৃতি। সুতরাং বিকাশ বলতে আমাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির গুনগত পরিবর্তনকে বুঝে থাকি।

আমরা জানি দৈহিক বিকাশের মত মানসিক বিকাশ ঘটে পর্যায়ক্রমে ছন্দ বন্ধ ভাবে। বিকাশ ধারার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই সক্রেটিস ও প্লেটো দুজনের বক্তব্যের মূলকথা বিকাশই শিক্ষা। আমরা জানি প্রতিটি শিশু এক একক সত্বা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি শিশুর মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। সেইদিক লক্ষ্য রেখে জীবনের শুরু থেকে গঠনগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন, লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে ঘটতে পারে। দৈহিক দিক থেকে, যেমন আয়তনগত বা দৈর্ঘ্যগত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় তেমনি মানসিক দিক থেকে বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক থাকলেও আধুনিক শিক্ষার চিন্তার দিক দিয়ে বিকাশের মধ্যে মূলগত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১.৩.৪. বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য

বৃদ্ধি	বিকাশ
১) বৃদ্ধি বলতে সম্পূর্নভাবে পরিমাণগত পরিবর্তন গুলিকে বোঝায়- যেমন ব্যক্তির দৈহিক উচ্চতা, ও ওজন ইত্যাদি।	১) বিকাশ হল ক্রমউন্নয়নশীল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ গুনগত প্রকাশ, ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য করা যায়।
২) বৃদ্ধি পরিবর্তনকে আমরা নৈবর্ত্তিক ভাবে বিচার করে থাকি।	২) বিকাশ সম্পর্কিত ধারণা এই অর্থে ব্যক্তিকেন্দ্রিক।
৩) বৃদ্ধি জীবনব্যাপি প্রক্রিয়া নয় কারণ এক নির্দিষ্ট সময় বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে।	৩) বিকাশ জীবনব্যাপি ঘটমান প্রক্রিয়া যার শুরু ঘটে জন্ম থেকে এবং চলে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত্য।
৪) বৃদ্ধি বলতে শুধুমাত্র দৈহিক বিকাশকেই বোঝায়।	৪) বিকাশ বলতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক, সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক অন্যান্য গুনগত পরিবর্তনকেই বোঝান হয়।
৫) বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় আধুনিক পরিমাপ ও কৌশল দ্বারা।	৫) বিকাশ পরিমাপ যোগ্য যা পরিমাপ করা হয় পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে।
৬) বৃদ্ধি বিকাশের একটি অংশ	৬) বিকাশ বলতে পরিবর্তন বুঝলেও এর তাৎপর্য ব্যাপক।

এই আলোচনা থেকে দেখা যায় বৃদ্ধি ও বিকাশ সংক্রান্ত ধারনা ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই বিকাশ প্রক্রিয়াকে যেমন বলা হয় শিক্ষা, তেমনি শিক্ষাকেও বিকাশ প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল

বলেছেন - The aim of education is development, the process of education is development.

অর্থাৎ মানবজীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যতীত সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়। আর জীবন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে না পারলে জীবনধারাও সম্ভব নয়। বিশেষভাবে এক্ষেত্রে শিশুর বংশগতিমূলক উপাদানগুলির ও তার পরিবেশ এর উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত হয়। শিশুর বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই প্রক্রিয়া কখনো মিলিত ভাবে আবার কখনো পৃথকভাবে বিকাশে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম সুত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য বা বংশগতি এবং পরবর্তীকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য সমূহের মিথস্ক্রিয়া সুষম বিকাশে প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করে।

১.৩.৫ বংশগতি কি?

বংশগতি হল এমন এক বিষয় যা শিশু তার বাবা-মার কাছে থেকে পায়, অথবা অন্য কোন পূর্বপুরুষের কাছ থেকে সে জন্মের সময়ে লাভ করে। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত জৈবিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

বংশগতি দুইভাবে অর্জিত হয়। প্রত্যক্ষ বংশগতি (Direct heredity) এবং পরোক্ষ বংশগতি (Indirect heredity) প্রত্যক্ষ বংশগতি হল শিশু তার বাবা-মার কাছ থেকে যে গুন অর্জন করে আর পরোক্ষ বংশগতি বলতে- বাবা-মা ছাড়াও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

১.৩.৬ পরিবেশ কি?

পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের জলবায়ু-আবহাওয়া অর্থাৎ মাটি, জল, আকাশ, বাতাস ইত্যাদি সবকিছুকেই বলা হয়। অর্থাৎ শিশু যে অবস্থাকে তার চারপাশে পায় তাকেই পরিবেশ বলে। এখানে পরিবেশ বলতে শিশুর প্রাকৃতিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ।

১.৩.৭ বৃদ্ধি ও বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব ঃ-

বৃদ্ধি ও বিকাশের ফলাফল নির্ভর করে একদিকে শিশুর সহজাত সম্ভাবনাবলী বা তার বংশধারার প্রকৃতির উপর অপরদিকে পরিবেশের স্বরুপের উপর। একথা সত্য যে শিশু যেকোনো ধরনের সম্ভাবনা নিয়ে জন্মাক না কেন না শিশুর পরিবেশ যেকোনো ধরনের উপাদান দিয়ে গঠিত হোক না কেন, সেগুলির পূর্ণবিকাশ নির্ভর করে বংশগতি ও পরিবেশের উপর। তাই শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশের যথাযথভাবে সংগঠিত হওয়া একান্ত প্রযোজন। তাই আধুনিক শিক্ষায় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের সমন্বয়ে এমন একটি পরিবেশ রচনা করা হয় যার মধ্যে শিক্ষার্থীর বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন (Check your progress - 2)

৪. পিঁয়াজে বৌদ্ধিক বিকাশের কয়টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন ও কী কী?

৫. ওয়াটসনের মতে আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি কী কী?

৬. Bobling কাকে বলে?

৭. দল গঠনের ক্ষেত্রে কিশোররা কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়?

৮. The aim of education is development, the process of education is development—বলতে কী বোঝেন?

১.৪. প্রত্যক্ষণের বিকাশ (Perceptual Development)

১.৪.১ প্রত্যক্ষণ বিকাশের ধারণা ঃ-

সাধারণত প্রত্যক্ষণ বলতে আমরা চোখ দিয়ে কোনো কিছু দেখা বুঝে থাকি অথবা কান দিয়ে কোনো কিছু শোনা বুঝে থাকি। কিন্তু দেখা বা শোনা ও প্রত্যক্ষণ এক কথা নয়। আমরা চোখ দিয়ে দেখি এবং কান দিয়ে শুনি, কিন্তু প্রত্যক্ষণ সবকটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হতে পারে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষন হল সংবেদনের অর্থযুক্ত রুপ।

প্রত্যক্ষণ একটি জটিল গঠনমূলক, সক্রিয়, মানসিক প্রক্রিয়া। কারণ, প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিচার ব্যাখ্যার জন্য কতগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আমরা জানি প্রত্যক্ষণ একটি উদ্দীপককে কেন্দ্র করে শুরু হয় এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে উদ্দীপকজাত সংবেদনের উপর নতুন ব্যাখ্যা আরোপ করে। সুতরাং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠন করার ব্যাপারে মনের কয়েকটি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

১) পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব
২) প্রসঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাব
৩) আবেগ ও মানসিক উত্তেজনার প্রভাব
৪) অভিভাবকের প্রভাব
৫) সমাজের প্রভাব

প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার দুটি দিক আছে -

১) উপস্থাপন মূলক প্রক্রিয়া - বর্তমানে যে সংবেদনটি প্রত্যক্ষকর্তার নিকট উপস্থাপিত হয়েছে।

২) পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সংবেদন পাওয়া, তার কী ধরনের ব্যাখ্যা বা প্রত্যক্ষকর্তার মধ্যে কি ধরনের ধারণা হবে তা কিছু প্রত্যক্ষকর্তার অতীত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাবের উপর নির্ভর করে, কারণ ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে যে সংবেদন হয় তা অতীত অভিজ্ঞতা আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে অনুষঙ্গ হয়ে থাকে। এই অনুষঙ্গের জন্য তা প্রশ্নকর্তার স্মৃতি পথে পুনরুজ্জীবিত করে দিচ্ছে। প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে অনুষঙ্গ ও পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া থাকে তা অতীত অভিজ্ঞতার ফল। তাই প্রত্যক্ষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলি স্তরের পরিচয় পাই। সেগুলি হল -

(ক) পৃথকীকরণ
(খ) সাদৃশ্য
(গ) অনুষঙ্গ ও পুনরুজ্জীবন
(ঘ) উৎস ও স্থান নির্ণয়
(ঙ) বিশ্বাস

প্রত্যক্ষণের উদাহরণ ঃ-

কোনো লাল ফুল প্রত্যক্ষ করার সময় ফল ও তার লাল রং স্বতন্ত্র্যভাবে জানা হয় না। একটি সম্পূর্ণ ফুল রূপে জানা হয়। কিন্তু সংবেদনের আমরা লাল একটি অংশ সম্পর্কে জানি। যেমন-লাল রং সংবেদনা। তাই সংবেদনকে ব্যাখ্যা করলেই তা আর সংবেদন থাকে না, প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়।

১.৫ দৈহিক ও অঙ্গাসঞ্চালনমূলক বিকাশ (Physical or Motor Development)

দৈহিক বা শারীরিক বিকাশের সঙ্গে আচরণের একটি স্পষ্ট সম্পর্ক আছে। শরীরের আকার ও আকৃতি শিশুর শারীরিক পারদর্শিতাতে প্রভাব বিস্তার করে, সামাজিক আচরণের সাফল্যের দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বৃদ্ধি দুভাবে হয় এক ঃ দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি, দুই ঃ ধীরে শারীরিক বৃদ্ধি, বৃদ্ধির চারটি স্তর আছে। (১) জন্ম থেকে ২ বছর দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি হয়। (২) তারপর ৮ থেকে ১১ বছর ধীরে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। (৩) এরপর ১১-১৬ বছর আবার দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি হয় এবং (৪) তারপর উচ্চতা এবং ওজনের যে বৃদ্ধি ঘটে তা ধীরেই হয়। বিভিন্ন বয়সে শিশুর উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

জন্মের সময় শিশুর উচ্চতা হয় ১৯ থেকে ২০ ইঞ্চি বা ৪৮ থেকে ৫১ সেমি।

২ বছর বয়সের শিশুর উচ্চতা হয় ৩২ থেকে ৩৪ ইঞ্চি বা ৮১ থেকে ৮৬ সেমি।

১৩ বছর বয়সে ছেলে/মেয়েদের উচ্চতা হয় ৬২/৬৩ ইঞ্চি বা ১৫৭/১৬০ সেমি।

১৮ বছর বয়সে ছেলে/মেয়েদের উচ্চতা হয় ৬৬/৬৯ ইঞ্চি বা ১৬৭/১৭৫ সেমি।

বিভিন্ন বয়সে শিশুর ওজনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়

জন্মের সময় শিশুর ওজন ৬-৮ পাউন্ডের বা ২-৩ কিলোগ্রামের মধ্যে হয়। কোনো কোনো শিশুর ৩-৪ পাউন্ডের বা ১$\frac{১}{২}$ -

২ কিলোগ্রামের ওজন হয়, আবার কোনো কোনো শিশুর ১৬ পাউন্ড বা ৭ কিলোগ্রামে ওজন হয়। জন্মের ১ মাস পরে শিশুর ওজন কিছুটা কমে যায়। তারপর আবার বাড়তে থাকে।

বছর	ছেলে	মেয়ে
৬ বছর	৪৯ পাউন্ড বা ২২ কিলোগ্রাম	৪৮.৫ পাউন্ড বা ২২ কিলোগ্রাম
১১ বছর	৮৫.৫ পাউন্ড বা ৩৮ কিলোগ্রাম	৮৮.৫ পাউন্ড বা ৪০ কিলোগ্রাম
১২ বছর	৯৬ পাউন্ড বা ৪৩ কিলোগ্রাম	—
১৫ বছর	—	১২৬.৫ পাউন্ড বা ৫৭ কিলোগ্রাম
১৬ বছর	১৪২ পাউন্ড বা ৬৪ কিলোগ্রাম	

শিশুর দেহের বৃদ্ধির ফলে যেমন তার আকারের পরিবর্তন হয় তেমনি দেহের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় মাথার বৃদ্ধি জন্মের পর একটু কম হারেই হয়। জন্মের সময় মাথার দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ দেহের ২২% হয়। জন্মের পর থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মাথার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হয় কিন্তু দেহের আকৃতি সেখানে প্রায় তিন গুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। ৫ বছর বয়সে মাথা সারা দেহের ১৩% হয়, ১২ বছর বয়সে ১০% এবং ১৮ বছর বয়সে ৮% হয়।

শিশুদের যে শুধুমাত্র দেহের আকারগত ও আয়তনগত পরিবর্তন ঘটে তাই নয়, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। যেমন- হাড়, দাঁত, স্নায়ুতন্ত্র, পেশিমূলক ক্রিয়া, শ্বসন-ক্রিয়া, পাচনতন্ত্র, জননতন্ত্র ইত্যাদি। এছাড়াও সঞ্চালনমূলক কাজগুলির দক্ষতা দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। যেমন- হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারা, খেলার জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারা, বল ছুঁড়তে ও ধরতে পারা ইত্যাদি।

সুতরাং শিক্ষার্থী-শিশুদের স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করতে দেওয়া, অনুশীলন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুস্থ দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। তাই শিক্ষক, পিতামাতা, সবসময়ই তাদের দৈহিক বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দেবেন।

১.৬ বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Development)

বৌদ্ধিক বিকাশ বলতে মানসিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যগুলির বিকাশ সাধনকে বুঝে থাকি যা ব্যক্তিকে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে। বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দিকগুলি হল ধারণা, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, চিন্তন, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদি। পিঁয়াজে (Piaget)-র মতে, এই মাত্রা বা দিকগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। পিঁয়াজে বৌদ্ধিক বিকাশের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন।

(1) সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক স্তর (Sensorimotor Stage) - ০ থেকে ২ বছর।

(2) প্রাক-ক্রিয়াগত স্তর (Preoperational Stage) - ২ থেকে ৭ বছর

(3) বাস্তব সক্রিয়তার স্তর (Concrete Operational Stage) - ৭ থেকে ১১ বছর

(4) নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর (Formal Operational Stage) - ১৯ বছরের পরবর্তী স্তর পর্যন্ত।

বৌদ্ধিক বিকাশে একাধিক উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বৌদ্ধিক বিকাশ বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। পিতামাতা, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ে সংগঠিত বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।

১.৭ ভাষার বিকাশ (Language Development)

মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদের মূলগত পার্থক্য হল এই যে, মানুষের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কথা বলার ক্ষমতা রয়েছে। আর ভাষা হল সেই কথা বলার মাধ্যম। শিশুর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষার বিকাশ শুরু হয়। এক বছর বয়সে সে মা-বাবা ইত্যাদি চার-পাঁচটি শব্দ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এর পরেই ১$^{১}/_{২}$ বছর বয়স থেকে ভাষার বিকাশ দ্রুততর হয় এবং ২ বছরের শেষে সে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ শব্দ আয়ত্ত করে এবং ৩ বছরের মধ্যে তার শব্দভান্ডার প্রায় ৯০০-এর কাছাকাছি যায়। মনোবিদ আর. সীসোর (R. Seashore) এক পরীক্ষা থেকে শিশুদের শব্দভান্ডারের (Vocabulary) বিকাশের সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত করেছেন। গড়ে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা কি পরিমাণ নতুন শব্দ আয়ত্ত করে তার তালিকা দেওয়া হল-

১$^{১}/_{২}$	বছর	বয়সের	শিশুদের	শব্দভান্ডারে	থাকে প্রায়	১০-১২টি শব্দ
২$^{১}/_{২}$	”	”	”	”	”	৩০০টি শব্দ
৪	”	”	”	”	”	৫৬০০টি শব্দ
৫	”	”	”	”	”	৯৬০০টি শব্দ
৬	”	”	”	”	”	১৪৭০০টি শব্দ
৭	”	”	”	”	”	২১২০০টি শব্দ
৮	”	”	”	”	”	২৬৩০০টি শব্দ
১০	”	”	”	”	”	৩৪৩০০টি শব্দ

সুতরাং, উপরিউক্ত তালিকা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে ভাষার বিকাশ ৩ থেকে ৮ বছর বয়সের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ হয়। তাই জীবনে ভাষায় বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভাষা ব্যাক্তি মনের প্রকাশে সহায়তা করে শুধু তাই নয়, — চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশেও সহায়তা করে।

১.৮ প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development)

মানুষের আচরণ অনেকাংশে তার প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক আচরণের পরিবর্তন হয়। আর জন্মমুহূর্ত থেকেই মানবশিশু প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়া করতে সক্ষম। ***ওয়াটসন*** (Watson) তিন ধরনের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন—ভয় (Fear), রাগ (Anger) এবং ভালবাসা (Love)। মনোবিদ ***এক্স. ব্রিজ*** (X. Bridge) শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে সদ্যোজাত শিশু উদ্দীপকের পৃথকীকরণ না করেই, প্রতিক্রিয়া করে। ফলে অনুভূতিরও পৃথকীকরণ হয় না। তিনি বলেছেন, ৩ মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভমূলক পরিবর্তন শুরু হয়।

শিশু যত বড় হয় ও পরিণত হয়, সে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গিক উভয় উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। আবার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। এইভাবে কৈশোরস্তরে বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক আচরণকে সমাজসম্মতভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর বা প্রক্ষোভমূলক পরিণমনের স্তরে পৌছায়।

১.৯ সামাজিক বিকাশ (Social Development)

জন্মাবস্থায় শিশু একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক (Ego-Centric) থাকে। সদ্যোজাত শিশু এবং জন্মের পর প্রায় ২ মাস সময় পর্যন্ত শিশু কেবলমাত্র কতকগুলো তীক্ষ্ণ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বিকাশ হয়ে সামাজিকীকরণ শুরু হয়। সামাজিক বিকাশ হল সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুর প্রতিনিয়ত মিথষ্ক্রিয়া ফল। এটা ঠিক যে, শিশুর সামাজিক আচরণ সামাজিক পরিবেশের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। ব্যক্তিজীবনে প্রথমে সাধারণ ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে সার্থকভাবে অভিযোজনের সবরকম কৌশলই সে আয়ত্ত করে। সহযোগিতা, সমবেদনা, দলের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি। এইভাবে সামাজিক প্রবণতার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ হয়।

শিক্ষাস্তর (Levels of Education)

জীবন বিকাশের স্তরের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তির বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভাগ করে তার জীবনকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ভাগ করব। এই সঙ্গে আমরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা পর্যায়ের কথাও উল্লেখ করব।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন হয়েছে, নতুন সংযোজন হয়েছে। বিভিন্ন কমিটি, কমিশন এবং রিপোর্ট সম্বলিত সুপারিশ ছাড়াও শিক্ষাবিস্তারের জন্য ভারতবর্ষে একাধিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষার একটি নতুন কাঠামোগত ধারণা গড়ে তুলেছেন। তা হল ঃ

(1) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	ঃ	১ থেকে ৩ বছরের জন্য।
(2) নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা	ঃ	৪ থেকে ৫ বছরের জন্য।
(3) প্রাথমিক শিক্ষা	ঃ	২ বা ৩ বছরের জন্য।
(4) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা	ঃ	২ বা ৩ বছরের জন্য।
(5) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	ঃ	২ বছরের জন্য।
(6) স্নাতক স্তরের শিক্ষা	ঃ	৩ বছরের জন্য।
(7) স্নাতকোতর স্তরের শিক্ষা	ঃ	২ বছরের জন্য।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষায় বর্তমানে যেসব শিক্ষালয় রয়েছে তা হল ঃ

(1) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর, (2) প্রাথমিক শিক্ষাস্তর, (3) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর, (4) উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর,

(5) উচ্চ শিক্ষাস্তর।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার স্তর হল নিম্নরূপ ঃ

উচ্চ শিক্ষা

↑

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

↑

মাধ্যমিক শিক্ষা

↑

প্রাথমিক শিক্ষা

↑

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

১.১০. সারসংক্ষেপ (Let us sumup)

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education) বলা হয়। যদিও অনেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর বলে থাকেন। কিন্তু যদি আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হিসাবে আর একটি শিক্ষাস্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করি , তবে এই প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনযাত্রা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। তার ফলে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে সুসংগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

'প্রাথমিক শিক্ষা' কথাটি বহুল প্রচলিত শব্দ। তথাপি এর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা নেই। শিক্ষাবিদগণ প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা গঠন করেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী কোনো ব্যাক্তিকে সমাজে সন্তোষজনক ও দায়িত্বশীল নাগরিক জীবনযাপনের জন্য যে শিক্ষা অপরিহার্য রূপে গ্রহণ করতে হয় তারই প্রাথমিক পর্যায় বা স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর বলা হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হল সমগ্র শিক্ষাকালের এমন অংশ যে এই সময় প্রত্যেক শিশুরই শিক্ষালয়ে থাকা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সময়কাল সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কোথাও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকালকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার কোথাও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার কালকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কোঠারী কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হবে ৫ বা ৬ বয়স বয়সে। এই শিক্ষা চলবে একটানা ৭ বছর। অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক ৫ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তর ১১ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার কাল ৪ বছর স্থায়ী হয়। অর্থাৎ ৫ বছর অথবা ৬ বছর বয়সে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় এবং ৯ অথবা ১০ বছর বয়সে শেষ হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল

নিম্ন প্রাথমিক স্তর (৫ বছর)
(I, II, III, IV, V শ্রেণি)

উচ্চ প্রাথমিক স্তর (৩ বছর)
(VI, VII, VIII শ্রেণি)

বাল্যকাল

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। শিক্ষাগত দিক থেকে এই জীবন বিকাশের স্তর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শৈশবকালে সব কিছুই থাকে অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। কিন্তু বাল্যকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও সংযত ভাব যেন দেখা যায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর জ্ঞান এবং আগ্রহ ও মানসিক বিকাশ যদি যথাযথভাবে না হয়, তবে পরবর্তীকালের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। সুতরাং এই স্তরের শিশুর জীবনবিকাশের বিভিন্ন দিকের বিকাশ যেমন দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ অনুশীলন করা দরকার। বাল্যকাল ছ'বছর থেকে এগার বছর পর্যন্ত বয়সকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই স্তরকে আমরা দুটো পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। এক ঃ প্রাথমিক বাল্যকাল— সাধারণত ছ' বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত; দুই ঃ প্রান্তীয় বাল্যকাল— সাধারণত নয় থেকে এগারো বছর অর্থাৎ বাল্যকাল শিক্ষাগত দিক থেকে নিয়মমাফিক শিক্ষা শুরু করার স্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। এখন আমরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণরত শিশুদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করব।

বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য

দৈহিক বিকাশ ঃ

জীবন বিকাশের এই স্তরে দেহ সঞ্চালনের দিক থেকে এদের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দৌড়ানোর ক্ষমতা, লাফানোর ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শিশু যখন শৈশবকাল থেকে বাল্যে পরিণত হয় তখন তাদের উচ্চতা এবং ওজন দুই বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে তার বিভিন্ন দৈহিক অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিভিন্ন হারে বাড়তে থাকে। ফলে শিশুর আচরণের উপর তার প্রভাব পড়ে। শারীরিক আকৃতির দিক দিয়ে যে ছোট তাকে সাধারণত আমরা অসহায়, দুর্বল ইত্যাদি মনে করে তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিই। কিন্তু এই স্তরের মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা দ্রুত, অর্থাৎ ৮ বছরের একটি মেয়ে ৮ বছরের একটি ছেলের চেয়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক

দিয়ে অধিক পরিণত। তাই এই স্তরে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শারীরিক ও যৌনবৃদ্ধির দ্রুততার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই স্তরে তার যৌনতা অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনও দিক দিয়েই তার কোনো বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখা যায় না। বস্তুত বাল্যকালে তার যৌনতার কোনো বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও সুপ্ত অবস্থায় তা তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এইজন্য ফ্রয়েড বাল্যকালকে যৌনতার প্রযুক্তকাল বলে বর্ণনা দিয়েছেন। এইজন্য এই বয়সে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এবং যে কোনো ধরনের কু-অভ্যাস তৈরি হয়। তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার এই স্তরে বিভিন্ন স্বাস্থ্যভ্যাস ও স্বাস্থ্য শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর দেহ, সঞ্চালনের সুযোগ পায় এবং তার দ্বারা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

মানসিক বিকাশ ঃ

মানসিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা যথেষ্ট উন্নত হয়। বুদ্ধি বিকাশের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বুদ্ধি শৈশবকাল থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১৫/১৬ বছর বয়সে তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয়। ভাষা বিকাশের দিক থেকে দেখা যায়, তাদের শব্দ ভান্ডার যথেষ্ট বিস্তৃত হয়। স্মৃতিশক্তি এই বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রখর থাকে। শিক্ষার্থী তার মানসিক প্রতিচ্ছবি ও অভিজ্ঞতাগুলোকে, ভাষামূলক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যাস করে এবং নির্দিষ্টক্রমে সাজায়। পিঁয়াজে বলেছেন, বিকাশের এই স্তরে চিন্তন প্রক্রিয়া ও যুক্তিশক্তির নির্ভুলতা বাড়লেও আট বছর বয়সের শিক্ষার্থীর স্থান এবং সময় সম্পর্কিত পরিণতি খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ তারা সময় ও স্থান সম্পর্কে প্রকৃত বিমূর্ত ধারণা গ্রহণ করতে পারে না। এই সময় শিক্ষার্থীর মানসিক চিন্তা ও ক্রিয়াগুলো অনেক বেশি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হয়। অর্থাৎ আট বছরের পরবর্তী স্তরে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা অর্জন এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। এই বয়সে ধারণা বা concept প্রাথমিকভাবে গঠন হয়। এবং এই ধারণাগুলি সক্রিয় চিন্তনে বা যুক্তিনির্ভর চিন্তনে সহায়তা করে। বৌদ্ধিক বিকাশের দিক থেকে একটি স্থায়ীভাব লক্ষ্য করা যায় এই স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিযোগিতাবোধ ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করে নিজের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঃ

প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রক্ষোভ হল অনুভূতিমুলক আর শিক্ষা হল জ্ঞানমুলক। জীবনবিকাশের স্তরে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ প্রক্ষোভই আমাদের সকল কাজের পেছনে প্রেরণা বা শক্তি জোগায়। প্রক্ষোভ জাগ্রত না হলে যেমন কোনও কাজ করার প্রেরণা জাগে না, তেমনই যদি প্রক্ষোভ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে ব্যাক্তির সাধারণ কর্মক্ষমতার মান নিচু হয়ে যায় এবং যতটুকু করা তার সামর্থ্যে সাধ্যাতীত সে শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। আবার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অভিব্যাক্তির মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার বাহ্যিক অভিব্যাক্তির তীব্রতা কমে আসে এবং তার আচরণও যথেষ্ট পরিমাণে সংযত ও মার্জিত হয়ে ওঠে। যেমন ৪/৫ বছরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার করে কাঁদে হাত-পা ছোঁড়ে, উদ্দাম আচরণ করে, কিন্তু ৭/৮ বছরের বয়সে রাগের সময় সে আর চিৎকার করে কাঁদে না বা ঐভাবে হাত-পা ছোঁড়ে না। আরও বড় হলে সে একেবারেই কাঁদে না এবং তার দৈহিক প্রকাশও অনেক বেশি মার্জিত ও সংযত হয়ে ওঠে। তার ফলে শিশু যত বড় হয় প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভিব্যাক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে যে ৭/৮ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অপরের কাছ থেকে গোপন করতে পারে। যেমন—দুঃখ, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদমিত অবস্থায় থেকে যায় এবং মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে

বিপর্যস্ত করে তোলে। অনেক সময় এই অবদমিত প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে এবং তা থেকে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তাই শিশুকে সার্থক শিক্ষা নিতে হলে তার প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষা কর্মসুচির একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। ভয়, বিশেষভাবে, এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। এই ভয় তাদের মনে কল্পিত বিপদের আশঙ্কা থেকেই দেখা যায়। যেমন—ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয় ইত্যাদি। যদি শিশুসুলভ ভয়ের বদলে তাদের মধ্যে যথাযথ প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা দেয়। ছোট ভাইবোনদের প্রতি ঈর্ষা দেখা দেয়, বাবা-মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তাদের মনে দেখা দেয়। বাবা-মায়ের প্রতি তাদের প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় ভুল বোঝার দরুন তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সামাজিক বিকাশ ঃ

বাল্যকালের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সামাজিকবোধের পরিণতি। শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক, যত বড় হয় ততই তার সামাজিক বোধ, বন্ধুপ্রীতি ও দলবাঁধার প্রচেষ্টারূপে দেখা দেয়। এই বয়স থেকে সত্যকারের সামাজিক হওয়ার কাজের শুরু হয়। একই স্থান বা একই সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থাকার জন্যও শিশুদের বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। এই সময়েই বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে পরিবারের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবেশিক বৈশিষ্ট্যও প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে প্রতিযোগিতার আচরণ দেখা যায়। ফারফে'র (Furfey) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে ১০ বছর বয়স থেকে শিশুদের মধ্যে মর্যাদাবোধ, দল আনুগত্য ইত্যাদি ধারণাগুলি যথেষ্ট পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সমাজপ্রীতি শিশুর আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের স্থান অধিকার করে। শিশুর সামাজিক বিকাশকে এই সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার যৌন চেতনার জাগরণ। ৯/১০ বছর বয়সের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই খেলতে ভালবাসে এবং বিপরীত দলের সঙ্গে মেলামেশার কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না। অর্থাৎ এই সময়ে একা খেলার চেয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা করতে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা ভালবাসে। সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহানুভুতি ইত্যাদি সামাজিক প্রবণতা এই বয়সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দলের প্রভাবে তারা যাতে অন্যায় কাজ না করে, খারাপ সঙ্গে না মেশে, দলের প্রভাবে তাদের ঈর্ষা ভাব যাতে না জাগে এবং অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মনোভাব না জাগে সেদিকে পিতা-মাতা, শিক্ষকদের নজর দিতে হবে। সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি সামাজিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঃ

শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বিষয় সেটি হল আচরণের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদিত মূল্যবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা। বিশেষ করে ৬/৭ বছর বয়সের পর থেকে ব্যাক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা যে মূল্যবোধ ধার্য করেন শিশু সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী তার নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। এইস্তরে শিক্ষার্থীরা উপদেশমূলক কাহিনি শুনতে ভালবাসে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিজের আচরণকে নীতিবোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কোহলবার্গ (Kohlberg) মানবজীবনের বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য নৈতিক বিকাশের তত্ত্বকে বেছে নিয়েছেন। কোহলবার্গ বিকাশকে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রম সমন্বয়ের প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক স্তরের বিকাশ, তার পূর্ব স্তরের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর পুনর্বিন্যাস হয়। শৈশবকালে শিশুর কিছু জ্ঞানমূলক বিকাশ হয়। কিন্তু বাল্যকালে নীতিবোধ যুক্তিনির্ভর হয়।

এই পর্যায়ে শিশুর নীতিবোধ বিশেষভাবে সামাজিক রীতি-নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। পরিবার, সামাজিক সংগঠন, পারিবেশিক অবস্থা, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির নিয়ম দ্বারা এই সময়কার নৈতিক বিচারকরণের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। এইভাবে তাঁর মধ্যে জন্মায় সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, এক কথায় সমাজের মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য এই সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই আবার বিকশিত হয় শিশুর নৈতিক বোধ।

সুতরাং বাল্যকালের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন কমিটি, কমিশন ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। **ভারতীয় শিক্ষা কমিশন** (১৯৬৪-৬৬) মত অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

(১) শিশুর মধ্যে সুস্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

(২) শিশুর বৌদ্ধিক, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও নান্দনিক চিন্তার বিকাশ ঘটনো।

(৩) প্রাক্ষোভিক পরিণমনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

(৪) সামাজিক সচেতনা ও মনোভাবের সঞ্চার ঘটানো।

(৫) সংস্কারহীন গণতান্ত্রিক খোলা মন তৈরি করা।

(৬) সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

(৭) শিশুকে দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হবার জন্য প্রস্তুত করা। শিশুর মধ্যে দেশের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করা, সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্যের মনোভাব জাগ্রত করা।

১.১১. অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১. নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (অনধিক ১৫০টি শব্দে)

(ক) শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া—বক্তব্যটির সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার শর্তগুলি আলোচনা করুন।

(গ) শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ—এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঘ) বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঙ) প্রাক্ষোভিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে ধারণা দিন।

(চ) শিশুর দৈহিক বিকাশে কোন কোন বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

(ছ) জীবনে ভাষার বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (অনধিক ২৫০টি শব্দে)—

(ক) বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(খ) জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুকে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করা। এই বিভিন্ন বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঘ) শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনমূলক বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঙ) শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১.১২. উত্তর সংকেত (Hints to Answer)

১. দৈহিক বিকাশ, বিকাশ প্রক্রিয়া, ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া, সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে। বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য।

২. বিকাশ হল সারা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে পরিণমন ও অভিজ্ঞতা যুক্ত থাকে।

৩. বৃদ্ধি ও বিকাশ সংক্রান্ত ধারণা ব্যাপক অর্থে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে শিক্ষার লক্ষ্য তৈরি হয়। আর জীবন পরিবেশের সঙ্গে বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে না পারলে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ হবে না।

৪. পৃথকীকরণ, সাদৃশ্য, আনুষঙ্গ ও পুনরুজ্জীবন, উৎস ও স্থান নির্ণয়, বিশ্বাস।

৫. পিয়াঁজে বৌদ্ধিক স্তরের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—

(ক) সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক স্তর -০ থেকে ২ বছর।

(খ) প্রাক্ ক্রিয়াগত স্তর — ২ থেকে ৭ বছর

(গ) বাস্তব সক্রিয়তার স্তর — ৭ থেকে ১১ বছর

(ঘ) নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর — ১টা বছরের পরবর্তী স্তর পর্যন্ত।

৬. ওয়াটসনের মতে আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া তিন প্রকার, যথা— ভয়, রাগ ও ভালবাসা।

৭. শিশু ১০-১২ মাসের হলে সে কতকগুলো অর্থহীন আওয়াজ করতে পারে একে Bobling বলে।

৮. আনুগত্য, মনোভাব ও মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয় জাগ্রত করার এযোজন।

শিখন প্রক্রিয়া ও শিখনের অর্থবোধ
(Understanding Learning and Learning Process)

গঠন (Structure)

২.১. সূচনা
২.২. উদ্দেশ্য
২.৩. শিখন প্রক্রিয়া
২.৩.১. শিখনের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য
২.৪. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের অর্থবোধ
২.৪.১. প্রাচীন অনুবর্তন
২.৪.২. সক্রিয় অনুবর্তন
২.৪.৩. অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন
২.৫. শিখনের প্রজ্ঞাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী
২.৫.১. জাঁ পিঁয়াজে
২.৫.২. জেরোম ব্রুণার
২.৫.৩. ডেভিড অসুবেল
২.৬. শিখনের নির্মিতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী
২.৬.১. বাইগট্স্কির সামাজিক নির্মিতিবাদ
২.৭. স্মৃতি ও বিস্মৃতি
২.৭.১. স্মৃতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
২.৭.২. বিস্মৃতি
২.৭.৩. বিস্মৃতির কারণ
২.৮. সার সংক্ষেপ
২.৯. অনুশীলনী
২.১০. উত্তর সংকেত

২.১ সূচনা (Introduction)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মনোবিজ্ঞানীরা শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আসছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শিখন কী সে সম্বন্ধে জানা এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা। এর ফলে শিখন সম্বন্ধে নানারকম দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। এইসব দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণভাবে বলা হয় শিখনের তত্ত্ব। আবার অনেকের মতে এগুলি শিখন প্রক্রিয়ার নানা প্রকারভেদ। এমন নয় যে এইসব তত্ত্ব বা **মতবাদের** কোন একটি ঠিক, বাকিগুলি ভুল। আসলে সব কয়টিই শিখনের কোনও না কোন দিক ব্যাখ্যা করে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি শেখার বিষয়বস্তু খুব সহজ সরল হতে পারে আবার জটিল ও কঠিন হতে পারে। আপনি যখন প্রথম সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে শিখেছিলেন তা অতি সহজেই শিখেছিলেন। কিন্তু মোবাইল ফোনের জটিল কলাকৌশল শিখতে আরও বেশি সময়, প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণ দরকার হয়েছিল। আবার কোন একটি জিনিসের নাম শিখতে আমাদের এক মুহূর্ত সময় লাগে অথচ ব্যাকরণের একটি সূত্র বা গণিতের নতুন কোন নিয়ম শিখতে গেলে এত সহজে হয় না।

শিক্ষণীয় বিষয়ের যেমন নানা প্রকারভেদ আছে তেমনি শিখন প্রক্রিয়াও নানারকম হতে পারে। সেই কারণেই প্রত্যেকটি তত্ত্ব বা পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াবার সময় উপযুক্ত সময়ে ঠিক ঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন।

এই পাঠ–এককের পরবর্তী অংশে এই বিষয়টিই আমরা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করব।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠ–এককের বিষয়বস্তু পড়ে আপনি –

- শিখনের অর্থ ও শিখন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিচে উল্লেখ করা শিখন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীগুলি আলোচনা করতে পারবেন ঃ
  - প্রাচীন অনুবর্তন
  - সক্রিয় অনুবর্তন
  - অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন
  - পিঁয়াজে, ব্রুণার ও অসুবেলের প্রজ্ঞাবাদী মত
  - প্রাথমিক শিক্ষায় বাইগটস্কির নির্মিতিবাদের তাৎপর্য এবং
- স্মৃতি ও বিস্মৃতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৩ শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process)

নিচের পরিস্থিতিগুলি সম্বন্ধে ভেবে দেখুন –

(ক) একটি ছেলে অনেকবার চেস্টা করতে করতে সাইকেল চালাতে দক্ষ হয়ে উঠল।

(খ) একটি শিশু প্রথমে অক্ষরগুলি চিনতে শিখল তারপর আরও বড় হওয়ার পর লিখতে শিখল।

(গ) প্রথমে যোগ অঙ্ক শেখার পর একটি মেয়ে, বিয়োগ অঙ্ক শিখল।

(ঘ) **পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা জানে, সূর্য পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, আসলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে বলেই এরকম মনে হয়।**

এখানে প্রত্যেকটি উদাহরণেই কিছু না কিছু শেখার কথা বলা হয়েছে। আপনাদের নিজের জীবনেও এরকম অসংখ্য বিষয় শেখার অভিজ্ঞতা আছে। আসলে আমরা শিখতে শিখতেই বড় হয়েছি। বড় হতে হতে শিখেছি। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন,

প্রথম ক্ষেত্রে ছেলেটি পূর্বে সাইকেল চালাতে গেলে পড়ে যেত, কিন্তু শেখার পর সে দক্ষভাবে সাইকেল চালাতে পারে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অক্ষরগুলি চিনে নাম করতে পারা এবং পরে সেগুলির অনুকরণ করে লেখার ক্ষমতা অর্জন করা।

তৃতীয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিয়োগ কষা নয়, যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে সেটিও বোঝার ক্ষমতা অর্জন করা।

আর চতুর্থ ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে বোঝার ক্ষমতা অর্জন করা। অর্থাৎ সে বুঝতে শিখেছে যে বাসে বা ট্রেনে যাওয়ার সময় গাছপালা যেমন উল্টোদিকে ছুটছে বলে মনে হয় কিন্তু আসলে আমরাই ট্রেনে বসে ছুটছি, পৃথিবী ও সূর্যের বেলাতেও ঠিক তাই ঘটে।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এইসব পরিবর্তনকে আচরণের (Behaviour) পরিবর্তন বলা হয়। উদাহরণগুলিতে যে সব আচরণের কথা বলা হয়েছে তার কিছু কিছু বাইরে থেকেই দেখা যায়, বোঝা যায়। যেমন, সাইকেল চালানো, অঙ্ক কষা ইত্যাদি। আর কিছু কিছু বাইরে থেকে বোঝা যায় না কারণ এগুলি মানসিক। যেমন, যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝা। অর্থাৎ, আচরণ এরকম নয়।

- যে আচরণ নানা কাজ ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে প্রকাশ পায় তাকে বলে **প্রকাশ্য আচরণ** (Overt behaviour)।
- যে আচরণ মানসিকভাবে সম্পন্ন হয় তা হল **অপ্রকাশ্য বা মানসিক আচরণ** (Covert behaviour)।

প্রকাশ্য আচরণের পিছনে প্রায়ই কোনও না কোন অপ্রকাশ্য আচরণ থাকে। যেমন, অঙ্ক কষার সময় হাতে কলমে যে কাজ করা হয় তা প্রকাশ্য কিন্তু তার পিছনে যে চিন্তা, যুক্তি ইত্যাদি থাকে তা অপ্রকাশ্য আচরণ।

এইসব আচরণ পরিবর্তনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হয়। নিজের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় প্রশিক্ষণেরও দরকার হয়। সুতরাং সব মিলিয়ে আমরা শিখন সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি।

শিখনের সংজ্ঞা – শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যা প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়।

এই সংজ্ঞা থেকে শিখনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

- শিখন একটি প্রক্রিয়া, শুধুমাত্র অন্তিম পরিবর্তনমাত্র নয়। যেমন, অক্ষর লিখতে পারা শিখনের অন্তিম ফল। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে লেখার কৌশল আয়ত্ত হয়, তাই হল শিখন।
- শিখনের ফলে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুই প্রকার আচরণেরই পরিবর্তন ঘটে। এই বিষয়টির উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।
- শিখনের ফলে যে পরিবর্তন হয় তা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এই কথার অর্থ, যতক্ষণ না নূতন কোন শিখনের ফলে পূর্ববর্তী আচরণ পরিবর্তিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পরিবর্তনটি স্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন, অঙ্কের একটি পদ্ধতি শেখার পর যদি আরও একটি নতুন পদ্ধতি শেখা যায় যা আগেকার পদ্ধতিটির চেয়ে ভালো তবে নতুন পদ্ধতিটি স্থায়ী হয় পুরানো পদ্ধতিটি পরিবর্তিত হয়ে যায়।
- শিখনের ফলে আচরণ উন্নততর হয়।
- প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণ শিখনের সহায়ক। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য আচরণ যাই হোক না কেন চেষ্টা না থাকলে আচরণের পরিবর্তন হবে না। সাইকেল চালানো কিংবা যুক্তি ও চিন্তা কোন ক্ষেত্রেই চুপচাপ বসে থাকলে শেখা হবে না।

এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একজন প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে আপনাকে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে।

- শিখনের ফলে আপনার ছাত্রছাত্রীদের আচরণের নির্দিষ্ট পরিবর্তন কী হবে তা আগে থেকে ভেবে রাখতে হবে।
- তাদের সচেষ্ট বা সক্রিয় করে তুলতে হবে।
- আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন হল কি না অর্থাৎ শিখন হলো কি না তা সঙ্গে সঙ্গেই যাচাই করে নিতে হবে।

উদাহরণ ঃ **শিখনের বিষয় ঃ** মৌলিক সংখ্যার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা।

যে সংখ্যা ১ ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

আচরণের পরিবর্তন : সংজ্ঞাটি শিখলে ছাত্রছাত্রীরা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত কোন কোন সংখ্যা মৌলিক তা বলতে পারবে, যা শেখার আগে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা বা যাচাই করা : আপনি উপরোক্ত কাজটি আপনার ছাত্রছাত্রীদের করতে বললেন। ঠিক ঠিক বলতে পারলে আপনি বুঝলেন তারা মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞা শিখেছে এবং বুঝেছে।

২.৪ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের অর্থবোধ (Understanding learning from different perspectives)

আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে শিখন একরকম নয় নানারকম হতে পারে। সরল ও জটিল শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে বিগত একশত বৎসরেরও বেশি সময় যাবৎ মনোবিজ্ঞানীরা অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন। তাঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে আসছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে অনেক তত্ত্বের। প্রতিটি তত্ত্বই শিখনের কোনও না কোন দিকের উপর আলোকপাত করেছে। প্রায় সব কয়টি তত্ত্বই শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারেন। সেজন্য কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও কয়েকটি আধুনিক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষকদের জানা দরকার।

মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তত্ত্বগুলি প্রধানত দুটি ধারা অনুসরণ করেছে। একটি ধারায় শিক্ষার্থীর প্রকাশ্য বা দৃষ্টিগোচর আচরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এরা মনে করেন প্রকাশ্য আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তনই শিখন। আর অপর দলের মনোবিজ্ঞানীরা অপ্রকাশ্য বা মানসিক আচরণের পরিবর্তনই শিখন বলে মনে করেন। পরে দেখা যাবে এদের মধ্যে বিরোধ যাই থাক শিক্ষকরা উভয় মতবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে সবচেয়ে ভালো ফল পেতে পারেন। প্রথমে প্রাচীন তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের অর্থ বুঝে নেওয়া যাক।

২.৪.১ প্রাচীন অনুবর্তন (Classical Conditioning)

রাশিয়ান শরীর বিজ্ঞানী আইভান পাভলভ (Ivan Pavlov) কুকুরের উপর পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে।

পাভলভের পরীক্ষা : যে কোন উচ্চতর প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করলে মুখে লালা নিঃসরণ হয়। এমনকি খাদ্য দেখলে, খাদ্যের নাম শুনলেও আমাদের মুখে লালা নিঃসরণ হয়। শারীর বৃত্তীয় ভাষায় এর নাম রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

অর্থাৎ বিশেষ উদ্দীপক আমাদের শরীরের উপর ক্রিয়া করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্য কোন উদ্দীপক ঐ বিশেষ প্রতিক্রিয়া (যেমন লালা নিঃসরণ) সৃষ্টি করতে পারে না।

পাভলভ তাঁর পরীক্ষণাগারে বিশেষ ব্যবস্থা করে একটি কুকুরের চোয়ালের নিচে এমনভাবে একটি নল লাগিয়ে দিলেন যে মুখে লালা নিঃসরণ হলেই তা ঐ নলের মধ্যে দিয়ে একটি বোতলে জমা হবে। পাভলভ প্রথমে কুকুরটিকে একটুকরো খাবার দিলেন। দেখলেন কতটা লালা বোতলে জমা হচ্ছে। তারপর প্রতিবার খাবার দেওয়ার আগে একটি ঘন্টাধ্বনি করে খাবার দিতে থাকলেন। কয়েকবার এরকম করার পর তিনি দেখলেন, ঘন্টাধ্বনি শোনার পরই বোতলে লালা জমা হচ্ছে, খাবার না দিলেও হচ্ছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে ঘন্টা শুনে লালা নিঃসরণের প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা নয়। কিন্তু স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ঘন্টাধ্বনির মত একটি উদ্দীপকও খাদ্যগ্রহণজনিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই প্রক্রিয়াকে পাভলভ বলেছেন 'অনুবর্তন' (conditioning) আর অনুবর্তনের ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে তা হল অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response)। আরও স্পষ্ট করে বলতে হয় কুকুরটি আগে ঘন্টাধ্বনি শুনে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া করত না। এখন ঘন্টার সাহায্যে লালা নিঃসরণ করতে শিখেছে। পাভলভের মতে –

বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়া যুক্ত করে নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া করার নাম শিখন ।

অর্থাৎ শিখন একটি অনুবর্তন প্রক্রিয়া মাত্র। নিচের ছকটিতে পাভলভের পরীক্ষার সার সংক্ষেপ দেখুন।

		উদ্দীপক		প্রতিক্রিয়া
প্রথম অবস্থা	।।	ঘন্টাধ্বনি	⟶	কুকুরের কোন প্রতিক্রিয়া নেই
দ্বিতীয় অবস্থা	।।	খাবার	⟶	কুকুরের লালা নিঃসরণ
তৃতীয় অবস্থা	।।	ঘন্টাধ্বনি ⟶ খাবার (একত্রে)	⟶	কুকুরের লালা নিঃসরণ
চতুর্থ অবস্থা	।।	ঘন্টাধ্বনি	⟶	কুকুরের লালা নিঃসরণ

চতুর্থ অবস্থায় ঘন্টাধ্বনি হল অনুবর্তিত উদ্দীপক এবং কুকুরের লালা নিঃসরণ হল অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া। সমগ্র প্রক্রিয়াটি অনুবর্তন।

'যে প্রতিক্রিয়া যে উদ্দীপককে স্বাভাবিক সেই উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে অন্য উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হবার প্রক্রিয়াকেই বলে অনুবর্তন' – Drever

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(ক) প্রতিদিন রাত্রি দশটায় রাতের খাওয়া হলে, দশটা বাজলেই ক্ষিদে পায়, অর্থাৎ শরীরে খাদ্যের চাহিদা বোধ হয়। এখানে সময়ের সঙ্গে ক্ষিদের অনুবর্তন ঘটেছে।

(খ) 'ক' বাবুকে ছাত্রছাত্রীরা খুব ভয় পায়। কারণ তিনি খুব বকেন। 'ক' বাবুকে দেখলেই তাদের বুকে মধ্যে ধুকপুক শুরু হয়। 'ক' বাবুর নাম শুনলেই ঐরকম অবস্থা হয়। এখানে নামের সঙ্গে ভয়ের অনুবর্তন ঘটেছে।

(গ) ক এই অক্ষরটি দেখিয়ে মা বললেন ক, শিশুও বললো ক। কয়েকবার এরকম করার পর মা অক্ষরটি আঙুল দিয়ে দেখানো মাত্রই শিশু বললো ক।

তৃতীয় উদাহরণে দেখা যাচ্ছে বিশেষ একটি রেখাচিত্র যে ক শিশু তা শিখল এবং বলতে শিখল। এখানে চিত্রটির সঙ্গে ধ্বনির অনুবর্তন ঘটেছে।

সুতরাং অনুবর্তনের মাধ্যমে শিখন হয়। পরিকল্পিতভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থী নতুন নতুন আচরণ করতে পারে এবং শিক্ষক সেই উদ্দেশ্যে অনুবর্তন সৃষ্টি করতে পারেন। অনুবর্তনের মাধ্যমে অভ্যাস গঠন সহজ হয়।

শ্রেণিকক্ষের উপযোগী উদাহরণ ঃ

(ক) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছড়া শুনতে ভালোবাসে, আনন্দ পায় এবং শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ছড়ার মাধ্যমে কোন সূত্র বা নিয়ম তারা সহজেই শিখে ফেলে। তারপর ছড়া বাদ গেলেও সূত্রটি বা নিয়মটি তারা বলতে বা কাজে লাগাতে পারে। প্রাচীনকালে 'শুভঙ্করের আর্যা' নামে ছড়াগুলি এইভাবেই অঙ্কশেখার মাধ্যম হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল।

(খ) নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক ক্লাসে এসেই খাতা পেন্সিল প্রস্তুত করে বসতে বলেন। শিক্ষককে ক্লাসের দিকে আসতে দেখেই ছাত্রছাত্রীরা খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল। তারা শৃংখলাপরায়ণ হতে শিখল।

পাভলভ দেখেছিলেন, অনুবর্তন হয়ে যাওয়ার পর ঘন্টা বাজালেই কুকুরের লালা বেরিয়ে আসে। যতবার ঘন্টা বাজানো হয় ততবারই ঐ প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু যদি বার কয়েক পর পর একবার করে খাবার না দেওয়া হয়, শুধুই ঘন্টা বাজানো হয়, তবে লালার পরিমাণ কমে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপক না ব্যবহার করলে অনুবর্তন লোপ পায়।

এর তাৎপর্য হল একবার শেখা হয়ে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে যে ভাবে শেখা হয়েছিল বা যা শেখা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

শিক্ষকরা কি করবেন ঃ

(ক) ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক ভালো লাগা মন্দ লাগাকে কাজে লাগিয়ে অনুবর্তন সৃষ্টি করলে তারা সহজে শিখবে।

(খ) কোন কিছু ভুল শিখে থাকলে তার অবলুপ্তি ঘটানোর জন্য যে পরিস্থিতিতে ভুল শেখা হয়েছিল তা এড়িয়ে চলবেন।

(গ) মাঝে মাঝে শেখার বিষয়বস্তুর যাতে আবার চর্চা হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ১ (Check Your Progress – 1)

নির্দেশ ঃ ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) শিখনের সংজ্ঞা দিন।

____

____

____

____

২) প্রাচীন অনুবর্তনের মূল নীতিটি কী?

____

____

____

____

৩) নিচের কোনটি অনুবর্তনের উপযোগী পদ্ধতি ?

(ক) আগে খাদ্য তারপরে ঘন্টা বাজানো।

(খ) আগে ঘন্টা বাজিয়ে তারপর দশ মিনিট পরে খাদ্য খেতে দেওয়া।

(গ) ঘন্টা বাজিয়ে পরক্ষণেই খাদ্য খেতে দেওয়া।

(ঘ) একসঙ্গে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে খাদ্য খেতে দেওয়া।

২.৪.২ সক্রিয় অনুবর্তন (Operant conditioning)

পাভলভের পরীক্ষায় দুটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ঃ

- পরীক্ষার কুকুরটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তার নড়াচড়ার উপায় ছিল না।

- পরীক্ষার জন্য এমন একটি প্রতিক্রিয়া বেছে নেওয়া হয়েছিল যা অত্যন্ত সরল এবং খাদ্যের উপস্থিতিতে ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটবেই।

কিন্তু আপনার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা যা শেখে, যেভাবে শেখে তা এত সরল নয়। আপনি ক্লাসে কোন প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতেও পারে নাও পারে। তাছাড়া তারা সচল সক্রিয় মানুষ, তাদের কোন মতেই নিষ্ক্রিয় করে রাখা যায় না। এখন প্রশ্ন হল, তারা কখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহী হবে? প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গটি বিশেষ জরুরি এই জন্য যে, উত্তর না পেলে শিক্ষক হিসাবে আপনি বুঝতে পারবেন না তারা শিখেছে না শেখেনি। নিচের তিনটি পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভেবে দেখুন।

- আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আপনি ছাত্র বা ছাত্রীকে খুব প্রশংসা করলেন। পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তার উৎসাহ বাড়ল।
- ভুল উত্তর দেওয়ার পর আপনি উত্তরটি সংশোধন করে না দিয়ে একটি ছাত্রকে খুব বকুনি দিলেন। পরবর্তী প্রশ্নের সময় সে আর সাহস করে উত্তর দিল না। বার বার বকুনি খেতে খেতে সে ক্লাসের প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করাই ছেড়ে দিল।
- একটি ছাত্র সঠিক উত্তর দেওয়ার পর আপনি কোন মন্তব্য না করে পরবর্তী পড়ায় মন দিলেন। ছাত্রটি পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল।

তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষকের প্রশ্ন করার উপর উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া নির্ভর করছে না বরং উত্তর দেওয়ার ফলে কী ঘটছে তাই স্থির করে দিচ্ছে পরবর্তী প্রতিক্রিয়াটি হবে কী না।

স্কিনারের পরীক্ষা ঃ

এই বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন বি.এফ.স্কিনার (B.F. Skinner)। প্রথমে ইঁদুর তারপরে পায়রা ও অন্যান্য প্রাণীদের উপরও তিনি পরীক্ষা করেন। প্রথম পরীক্ষার সময় একটি বিশেষ 'বাক্স (Skinner Box নামে পরিচিত) এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে একটি ইঁদুরকে তার মধ্যে ছেড়ে দিলে সেটি স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারে। বাক্সে এমন একটি ব্যবস্থা করা আছে যে ইঁদুরটি যখনই একটি কাঠের লিভারের উপর চাপ দেয় তখনই একদানা গম তার সামনে এসে পড়ে।

ইঁদুরটি বাক্সে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে আকস্মিকভাবে লিভারে চাপ দিল এবং পুরস্কার হিসাবে একদানা গম পেল। যতবারই লিভারে চাপ পড়ে ততবারই ইঁদুরটি পুরস্কৃত হয়। বার বার এরকম হতে হতে ইঁদুরটি ঘন ঘন লিভাবে চাপ দেওয়ার উৎসাহ বাড়ল এবং এর ফলে সে সরাসরি খাদ্য পাওয়ার কৌশলটি শিখে ফেলল।

পায়রা, মুরগি প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম আরও পরীক্ষা করেছিলেন স্কিনার। আর একটি পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছিল পায়রা। পাখিদের স্বভাব সবকিছু ঠোঁট দিয়ে ঠোকরানো। পায়রার বাক্সটিতে পাশাপাশি একটি সাদা ও একটি কালো গোল দাগ ছিল। যদি দৈবাৎ কখনও পায়রাটি সাদা দাগের ওপর ঠোকরায় তা হলে

একটি গমের দানা বেরিয়ে আসে। কিন্তু কালো দাগটিকে ঠোকরালে মৃদু বৈদ্যুতিক শক পাওয়া যায়। স্কিনার **লক্ষ্য** করলেন প্রথম প্রথম পায়রাটি উদ্দেশ্যহীনভাবে হঠাৎ হঠাৎ সাদা অথবা কালো দাগটির উপর ঠোকরাচ্ছিল। কিন্তু সাদা দাগ থেকে গমের দানা ও কালো দাগ থেকে শক পাওয়ার ঘটনা বার বার ঘটতে থাকায় সে ক্রমশই কালো দাগ এড়িয়ে চলতে থাকল এবং সাদা দাগের উপর ঠোকরানোর প্রবণতা বাড়তে থাকল।

এবার স্কিনার সাদা দাগ ও কালো দাগের অবস্থান পাল্টে দিলেন এবং **ক্রমাগতই** আচমকা পাল্টাতে থাকলেন। কিন্তু দেখা গেল যে অবস্থানেই থাকুক পায়রাটি শুধু সাদা দাগের উপরই ঠোকরাচ্ছে, কালো দাগ এড়িয়ে যাচ্ছে। স্কিনারের মতে পুরস্কার ও শাস্তির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পায়রাটি সাদা ও কালোর পার্থক্য করতে শিখেছে।

এই পরীক্ষা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। যেমন,

- যদি আমরা কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশেষ একটি আচরণ করি এবং তার ফল যদি সন্তোষজনক হয় তবে সেই আচরণটি বার বার করার প্রবণতা হয় এবং বার বার করতে করতে সেটি স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়।
- অনুরূপভাবে যদি কোন আচরণের ফল পীড়াদায়ক হয় তবে সেই আচরণটি আমরা এড়িয়ে চলি এবং এর ফলে সেটি লোপ পেয়ে যায়।

প্রথমেই যে উদাহরণ তিনটি দেওয়া হয়েছিল এবং স্কিনারের পরীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এই দুটি সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে।

স্কিনার পুরস্কার বা শাস্তি কথাগুলি ব্যবহার করেননি। যা আমাদের বিশেষ একটি আচরণকে বারবার করতে প্রণোদিত করে তাকে তিনি বলেছেন প্রবলক (Reinforcer) আর এইভাবে কোন আচরণকে স্থায়ী আচরণে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বলেছেন প্রবলন (Reinforciment)।

সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিখন বলতে আমরা কী বুঝি?

শিখন হল কোনও একটি প্রবলকের সাহায্যে নতুন কোন আচরণ আয়ত্ত করার প্রক্রিয়া।

কোন প্রতিক্রিয়া করার পর তার ফল অনুযায়ী যদি ঐ আচরণটি বার বার করার প্রবণতা দেখা যায়, তবে প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় প্রবলন।

শিখনের এই নীতি শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। শিক্ষক এই নীতি প্রয়োগ করে সহজেই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আচরণ পরিবর্তন করতে পারেন, অবাঞ্ছিত আচরণ দূর করতে পারেন, এবং নতুন আচরণ করতে শেখাতে পারেন।

স্কিনারের নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

- প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে কোন কিছু যা আপনি শেখাতে চাইছেন, তা শিখলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটবে (আচরণের পরিবর্তন)।

উদাহরণ - আপনি শেখাতে চাইছেন মহিষ এই শব্দটির ইংরাজী Buffalo। Buffalo কথাটি শিখলে তিনটি নতুন আচরণ শিক্ষার্থী করতে পারবে। প্রথম, মহিষের ইংরাজী Buffalo **বলতে** পারবে। দ্বিতীয়, Buffalo কথাটি **লিখতে** পারবে এবং তৃতীয়, সঠিক বানানটিও **লিখতে** পারবে।

- ভেবে রাখতে হবে এই তিনটি আচরণ সঠিকভাবে করতে পারলে প্রবলক হিসাবে কী ব্যবহার করা হবে।

উদাহরণ - ছবিতে একটি মহিষকে দেখালে নানারকম পশুর নামের তালিকা থেকে Buffalo কথাটি চিহ্নিত এবং উচ্চারণ করতে পারলে তাকে সম্মতিসূচক প্রশংসা করা হবে। এর ফলে যখনই মহিষের ইংরাজী জিজ্ঞাসা করা হবে তখনই সে Buffalo কথাটি বলতে উৎসাহিত হবে। এখানে প্রশংসা প্রবলক হিসাবে কাজ করছে। যদি আপনি চুপচাপ থেকে অন্য বিষয়ে চলে যান, তবে শিক্ষার্থী সংশয়ে থাকবে এবং দ্বিতীয়বার Buffalo বলতে ইতঃস্তত করবে।

- প্রবলকের প্রয়োগ সুচিন্তিত ভাবে করতে হবে। প্রতিক্ষেত্রেই একই প্রবলক কার্যকর হয় না।

উদাহরণ - প্রতিটি সঠিক উত্তরের পর শিক্ষক যদি একই ভাষায় একইভাবে প্রশংসা করেন তবে তা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। প্রবলক হিসাবে তার কোন মূল্য থাকে না।

- অনেকটা বিষয় একসঙ্গে না শিখিয়ে বিষয়টিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। একটি ভাগ সঠিকভাবে শেখা হলে পরবর্তী অংশটি শেখাতে হবে। এইভাবে ধাপে ধাপে সমগ্র অংশটি শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যে গতিতে কোন কিছু আয়ত্ত করতে পারে, তাদের সেই গতি অনুযায়ী শিখতে দিন। অর্থাৎ তাদের বয়স অনুযায়ী যে শিখন ক্ষমতা তাকেই মান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ - উপরের উদাহরণে উচ্চারণ, লেখা এবং বানান তিনটি স্বতন্ত্র আচরণ ও ধাপ।

অবাঞ্ছিত আচরণের পরিবর্তন - শুধু যে নতুন আচরণ আয়ত্ত করার জন্যই স্কিনারের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তা নয়, অবাঞ্ছিত কোন আচরণ পরিবর্তন করার জন্যও এর কার্যকারিতা যথেষ্ট। একে বলা হয় আচরণের পরিবর্তন (Behaviour modification)। পায়রাকে সাদা ও কালোর প্রভেদ শেখাতে যেয়ে স্কিনার যে পরীক্ষা করেছিলেন সেটি মনে করে দেখুন। সাদা দাগে ঠোকরালে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছিল আর কালো দাগে ঠোকরালে মৃদু ইলেকট্রিক শক। প্রথমটি পুরস্কারবাচক প্রবলক আর দ্বিতীয়টি শাস্তিমূলক। শাস্তিমূলক প্রবলক আচরণের বিলুপ্তি ঘটায়। যে জন্য পায়রাটি আর কালো দাগে ঠোকরায় নি। সুতরাং আমরা দুই প্রকার প্রবলন ও প্রবলকের বিপরীত কার্যকারিতা দেখতে পেলাম।

ইতিবাচক প্রবলন - কোন কাজ করার পর যদি সন্তোষ বা আনন্দদায়ক প্রবলক প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই কাজটি বার বার করার চেষ্টা হয়। একে বলে ইতিবাচক প্রবলন।

নেতিবাচক প্রবলন – কোন কাজ করার পর যদি শাস্তিমূলক অভিজ্ঞতা লাভ হয় তবে ঐ কাজটি আর করতে ইচ্ছা হয় না। ঐ কাজটি বা আচরণটি লোপ পায়। একে বলে নেতিবাচক প্রবলন।

উদাহরণ – কোন শিশু আপনাকে তার খেলনাটি দিল। আপনি খেলনাটি নিয়ে তাকে খুব আদর করলেন। সে খেলনাটি বার বার আপনাকে দিতে চাইবে। ক্রমে তা অন্যকে কিছু দেওয়ার স্থায়ী আচরণে পরিণত হবে। এটি একটি ইতিবাচক প্রবলন।

আপনার ক্লাসের কোন ছাত্র ও ছাত্রী বার বার একই বানান ভুল করে। তাকে সঠিক বানানটি বলে দিলেও ভুল করে। যখনই সে সঠিক **বানানটি** লিখতে পারে তখনই আপনি তাকে **সপ্রশংস** উৎসাহ দিন। ভুল বানান লিখলে তাকে আপনার অসন্তোষ জানান। ধীরে ধীরে সে ভুল বানানের পরিবর্তে সঠিক বানানটি বেশি করে লিখবে এবং ভুল বানান লেখা এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। অসন্তোষের মাধ্যমে তার এই আচরণের পরিবর্তন নেতিবাচক প্রবলনের উদাহরণ।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রবলনের উপযুক্ত প্রয়োগ করা হলে ক্রমশ অবাঞ্ছিত আচরণ কমবে এবং বাঞ্ছিত আচরণ আয়ত্ত হবে। ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে আপনি যদি শিক্ষার্থীদের লক্ষ করেন তবে অনেক অবাঞ্ছিত আচরণের তালিকা তৈরি করতে পারবেন নিচে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল।

শিখন সম্পর্কিত আচরণ

অবাঞ্ছিত আচরণ (দূর করতে হবে)	**বাঞ্ছিত আচরণ (বিকাশ ঘটাতে হবে)**
▪ পড়ার সময় শব্দ বাদ দিয়ে যাওয়া।	▪ প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে পড়া।
▪ ভুল উচ্চারণ করে পড়া।	▪ সঠিক উচ্চারণ করে পড়া।
▪ অঙ্ক কষার সময় সংখ্যা বাদ দিয়ে যাওয়া বা ভুল লেখা।	▪ ঠিক ঠিক মত সমস্ত সংখ্যা লেখা।
▪ এক শব্দের **পরিবর্তে** অন্য শব্দ লেখা।	▪ সঠিক শব্দটি লেখার অভ্যাস।

শিখন সহায়ক আচরণ

▪ অমনোযোগ বা মনোযোগের বিক্ষেপ প্রবণতা।	▪ উপযুক্তভাবে মনোযোগ প্রয়োগ ও ধরে রাখা।
▪ অতি চঞ্চলতা।	▪ প্রয়োজনের সময় শান্ত হয়ে বসার অভ্যাস।
▪ অস্পষ্ট উচ্চারণে অতি দ্রুত কথা বলা।	▪ স্পষ্ট উচ্চারণে সংযতভাবে কথা বলা।
▪ খারাপ হস্তাক্ষর।	▪ পাঠযোগ্য সুন্দর হস্তাক্ষর।

- বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ রাখার প্রবণতা
- অন্যের কথার মধ্যে ধৈর্য্য হারানো
- বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ করার অভ্যাস।
- অন্যের কথা শোনার ধৈর্য্য।

২.৪.৩ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন (Learning by Insight)

আমরা যখন আকাশের নক্ষত্রমন্ডলীর দিকে দেখি তখন অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে কিছু কিছু তারা মিলে কোন একটি পরিচিত নক্সার (জিজ্ঞাসা চিহ্ন) মত দেখায়। আমরা তার নাম বলি সপ্তর্ষি মন্ডল। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দেখাটা সবটাই কাল্পনিক। আমরা কল্পনায় একটি রেখা টেনে সাতটি তারাকে পরপর মনে মনে যুক্ত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দেখি।

এইভাবে তিনটি বিন্দুকে (চিত্র ক) একটি ত্রিভূজ বলে মনে হয়, চারটি বিন্দুকে তদের অবস্থানের জন্য

ক খ গ ঘ

একটি বর্গক্ষেত্র বলে মনে হয় (চিত্র খ)। কিন্তু ঐ তিনটি বা চারটি বিন্দুই ভিন্ন অবস্থানে (চিত্র গ এবং ঘ) সরল রেখা বলে মনে হতে পারে। অথচ কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত ত্রিভূজ, বর্গক্ষেত্র বা সরলরেখা আঁকা হয়নি। তাদের সংযোগ রেখাগুলি কাল্পনিক। এই যে মনে মনে একটা সম্পূর্ণ নক্সা তৈরি করে নেওয়া সেটাকে আমরা প্রকাশ্য আচরণ বলতে পারি না। কিন্তু যদি আমরা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ত্রিভূজ বা বর্গক্ষেত্র সম্বন্ধে আগে কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করতাম তবে ঐ নামগুলি বলতে না পারলেও নক্সাটি ঠিক একইরকম দেখতাম।

প্রশ্ন হল যদি আমরা সপ্তর্ষিমন্ডলের প্রতিটি নক্ষত্র অথবা উপরের চিত্রগুলির প্রতিটি বিন্দুকে আলাদাভাবে একটি একটি করে দেখি তবে কি নক্সাটি দেখতে পাব? দেখা গেছে, আমরা তা পারি না। সবগুলিকে সমগ্রভাবে একসঙ্গে দেখলে তবেই আমাদের কাছে নক্সাটি স্পষ্ট হয় – টুকরো টুকরো করে দেখলে তা হয় না।

এই বিষয়টি নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন জার্মানীর তিনজন মনোবিজ্ঞানী। তার মধ্যে কোয়েলার (Kohler) নামে মনোবিজ্ঞানী শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করেছিলেন প্রায় একশত বৎসর পূর্বে।

কোয়েলারের পরীক্ষা – কোয়েলার তাঁর পোষা শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে এই পরীক্ষা করেন। শিম্পাঞ্জী বুদ্ধিমান প্রাণি। তারা বুদ্ধি দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। কোয়েলার একটি উঁচু খাঁচার ছাদ থেকে কলা ঝুলিয়ে দিলেন। খাঁচার মধ্যে রাখলেন দুটি কাঠের বাক্স। কলাগুলি যতটা উঁচুতে তাতে হাত দিয়ে নাগাল পাওয়া

শিম্পাঞ্জীর পক্ষে সম্ভব নয়। একটি কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়েও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি একটি বাক্সের উপর আর একটি বাক্স রেখে তার উপর ওঠা যায় তবে কলার নাগাল পাওয়া যায়। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে নানাভাবে কলা পাড়তে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। কোয়েলার বাইরে থেকে সবকিছু দেখছিলেন। শিম্পাঞ্জীটি চেষ্টা করা ছেড়ে দেওয়ার পর, তিনি আপন মনে একটি হাতের উপর আর একটি হাত রেখে তাকে দেখাতে থাকলেন। শিম্পাঞ্জী সেটা **লক্ষ্য** করে কলা ও কাঠের বাক্স দুটি ভালো করে দেখতে থাকল। হঠাৎ সে একটি বাক্সের উপর আর একটি বাক্স রেখে তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে কলা পেড়ে নিল। এরপর যখনই ঐ পরিস্থিতিতে তাকে রাখা হত, সে অনায়াসে কলা পেড়ে আনত। অর্থাৎ শিম্পাঞ্জীটি উঁচু জায়গা থেকে ঐ পদ্ধতিতে কলা নামানোর কৌশল শিখল, নিজের চেষ্টায় এবং কৌশলটি আবিস্কার করার মাধ্যমে।

একই ধরনের আর একটি পরীক্ষায় কোয়েলার কলা রাখলেন খাঁচার বাইরে। খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে কলার নাগাল পাওয়া যায় না। খাঁচার মধ্যে দুটি দন্ড রাখা আছে কিন্তু তার কোনটিই এত লম্বা নয় যে তার সাহায্যে কলা টেনে আনা যাবে। একমাত্র যদি একটি লাঠির সঙ্গে আর একটি লাঠি জুড়ে দেওয়া যায় (লাঠি দুটি সেরকমভাবেই তৈরি) তবে কলা টেনে খাঁচার কাছে আনা সম্ভব। এবারও শিম্পাঞ্জীটি কয়েকবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল। কোয়েলার তাঁর দুই হাতের আঙুল একটির সঙ্গে আর একটি বার বার ঠেকাতে থাকলেন। সেটি লক্ষ করে শিম্পাঞ্জীটি দুটি লাঠি নিয়ে একসঙ্গে ঠেকাতে ঠেকাতে হঠাৎ একটির সঙ্গে আর একটি জুড়ে দিল। এরপর সহজই সে কলা টেনে আনল। এবারেও শিম্পাঞ্জীটি নতুন একটি কৌশল শিখল।

কোয়েলারের সিদ্ধান্ত – এই দুটি পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যেভাবে শিম্পাঞ্জীটি সমস্যা সমাধানের কৌশল শিখছে তা স্কিনারের প্রবলন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্য করা যায় না। কারণ স্কিনারের মতে আগে আচরণ করলে (সাদা দাগে পায়রার ঠোকরানো) এবং তার ফল সন্তোষজনক হলে (খাদ্য পাওয়া) ঐ আচরণটি বার বার করতে করতে তা স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়। কিন্তু শিম্পাঞ্জী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় কলার নাগাল পায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তোষ বা **অসন্তোষের** কোন প্রশ্ন আসে না। প্রবলনের কোন সুযোগ এখানে নেই। সুতরাং শিখন প্রক্রিয়াকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

কোয়েলার মনে করেন, কলার অবস্থান, কাঠের বাক্স বা লাঠির উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য, নিজের অবস্থান ইত্যাদির মধ্যেকার সম্পর্কটি সামগ্রিকভাবে না বুঝলে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব নয়। সেইজন্যই অনেকবার চেষ্টা করে শিম্পাঞ্জী হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু কোয়েলারের ইঙ্গিত পেয়ে হঠাৎ তার চিন্তায় পারস্পরিক সম্পর্কের নক্সাটি ভেসে ওঠে। তৎক্ষণাৎ সমাধানের কৌশলটি শেখা হয়ে যায়। সুতরাং শিখন বার বার চেষ্টা করলেই হওয়া সম্ভব নয়। শেখার পরিস্থিতিতে যে সব উপাদান আছে তাদের মধ্যেকার সামগ্রিক সম্পর্কটি বুঝতে না পারলে অন্ধভাবে চেষ্টা করা বৃথা।

আকস্মিকভাবে আলো জ্বাললে সবকিছু যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রেও হঠাৎ ঐ সম্পর্কের বোধ জাগ্রত হয়েছে। কোয়েলার একে নাম দিয়েছেন **অন্তর্দৃষ্টি (Insight)**। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনকে ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে –

সামগ্রিক রূপটি প্রত্যক্ষণ করে সমস্যা সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করার মানসিক প্রক্রিয়ার নামই শিখন। সামগ্রিক রূপটি যে আকস্মিক প্রক্রিয়ায় আমাদের মনে ভেসে ওঠে তাকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি। অর্থাৎ শিখন সম্পন্ন হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে।

মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পঠনপাঠনের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব অসীম। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুন।

২১৫টি পেন্সিল ৮৫ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হল যে প্রত্যেক ছেলে ২টি এবং প্রত্যেক মেয়ে ৩টি করে পেন্সিল পায়। ৮৫ জনের মধ্যে কতজন ছেলে এবং কতজন মেয়ে?

এই অতি সাধারণ পাটীগণিতের সমস্যাটি সমাধান করার জন্য সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের জ্ঞানই যথেষ্ট। যা কিছু তথ্য সমস্যাটিতে দেওয়া হয়েছে তার এক একটিকে যদি আপনি আলাদাভাবে বিচার করেন তবে সমস্যাটির সমাধান শেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আপনি প্রত্যেকটি তথ্যের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং পূর্বে শেখা চারটি মৌলিক নিয়ম একত্র করে একটি মানসিক ছক অনুভব করেন তবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে হবে প্রত্যেকেই কমপক্ষে দুটি করে পেন্সিল পাওয়ার অধিকারী, মেয়েরা শুধু একটি করে অতিরিক্ত পেন্সিল পাবে। এই অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হওয়া মাত্রই সমাধানটি শেখা হয়ে যায়।

সম্পর্কের নক্সা বা ছকটি সম্বন্ধে বোধ হওয়ার কয়েকটি শর্ত আছে।

প্রথম শর্ত, যে বিষয়গুলি একইরকম অর্থাৎ যাদের মধ্যে কোনরকম মিল আছে, তারা সহজে একত্রিত হয়ে আমাদের মনে একটি সামগ্রিক প্রতিরূপ গড়ে তোলে।

দ্বিতীয় শর্ত, যে উপাদানগুলি কাছাকাছি আছে তারা সহজেই একটি নক্সার আকারে গঠিত হয়। মনে করে দেখুন সপ্তর্ষিমন্ডলের তারাগুলি কাছাকাছি আছে বলেই আমার জিজ্ঞাসা চিহ্নের নক্সাটি দেখি। সারা আকাশে ছড়িয়ে থাকলে এরকম মনে হত না।

তৃতীয় শর্ত, যে নক্সা পরিচিত আমরা সেই নক্সাই আগে দেখি। জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমাদের সুপরিচিত নক্সা। যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কখনও দেখেনি তার কাছে মনে হতে পারে, নক্সাটি একটি খড়োর মত। এই জন্যই 'বৌ কথা কও' পাখির ডাক এক এক অঞ্চলের মানুষ এক একরকম শোনে। অর্থাৎ পাখির ডাকের মধ্যেকার শব্দগুলি প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে নক্সা তৈরি করে নিয়ে ব্যাখ্যা করে।

অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে শিখনের প্রয়োগ – শিক্ষকরা অন্তর্দৃষ্টির তত্ত্বটিকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষ করে তুলতে পারবেন। তার জন্য কী করবেন তার কয়েকটি নীতি নিচে দেওয়া হল।

- শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তুর সমগ্ররূপটি তুলে ধরুন।

উদাহরণ – যখন কোন কবিতা পড়াতে হবে তখন সমস্ত কবিতাটি পড়ুন বা ছাত্রছাত্রীদের পড়তে বলুন। সমস্ত কবিতাটির মূল বিষয় প্রথমে বলুন তারপর অংশ বিশেষের প্রতি মনোযোগ দিন।

- অংশবিশেষ বাদ দিয়ে শুরু করে ধাপে ধাপে সমগ্র অংশটির ধারণা না দিয়ে সমগ্র ধারণা থেকে শুরু করে তারপর খুঁটিনাটির দিকে নজর দিন।

উদাহরণ – একটি গাছের মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি প্রথম থেকেই আলাদাভাবে না শিখিয়ে প্রথমেই সম্পূর্ণ গাছটি দেখতে দিন। তারপর তার ফুল, ফল, পাতা ইত্যাদি কোনটি কেমন তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে দিন।

- যেসব বিষয় বা ধারণা একপ্রকার (সদৃশ) সেগুলি একসঙ্গে তুলে ধরুন। কোথায় কোথায় মিল আছে তা ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে দেখতে বলুন তারপর নিজেই দেখিয়ে দিন।

উদাহরণ – মটর গাছের ফুল ও ফল এবং শিমের ফুল ও ফল একপ্রকার। কিন্তু তাদের কান্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে।

- ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই যা শিখেছে বা পূর্বদিন যা শিখেছে আজকের বিষয়টি তার সঙ্গে যুক্ত করে দিন। জানা থেকে শুরু করে অজানা তথ্য দিন।
- যে বিষয়গুলি একত্রিত হয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি হবে সেগুলি শেখানোর মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রাখা উচিত নয়।

মনে রাখতে হবে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ধারণা অনুযায়ী মানুষের জ্ঞান সব সময়ই একটি সম্পূর্ণ একক হিসাবে তৈরি হয়। কখনই তা আংশিক নয়।

কোয়েলার ও তাঁর সহযোগীরা মনে করেছিলেন, অন্তর্দৃষ্টি আকস্মিকভাবে জাগ্রত হয়। অর্থাৎ শিখনের সময় হঠাৎ সমগ্র রূপটির নক্সা মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কোন কিছুই আকস্মিক নয়। সুনির্দিষ্ট মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের ছোটবেলা থেকেই শিখনের প্রক্রিয়ার পিছনে কাজ করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ২ (Check Your Progress – 2)

নির্দেশ ঃ ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) প্রবলন কাকে বলে?

____

____

____

____

২) ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রবলনের পার্থক্য কী?

৩) নিচের আচরণগুলি পরিবর্তন করতে হলে কীধরণের প্রবলন প্রয়োজন? (পাতার শূন্যস্থানে লিখুন)

(ক) একটি ছাত্র অঙ্কে ভয় পায়। ____________

(খ) প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রী সঠিক কিন্তু অভিনব উত্তর দিল। ____________

৪) অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন বলতে কী বোঝায়?

৫) সমগ্রতা বোধের শর্তগুলি কী কী?

৬) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কী?

স্কিনার ও পাভলভের সঙ্গে কোয়েলার ও তাঁর সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলনা করলে সবটা বিষয় মনে রাখতে সুবিধা হবে।

স্কিনার ও পাভলভ	কোয়েলার ও তাঁর সহযোগীরা
▪ শিখন কী?	
শিখন প্রকাশ্য আচরণের পরিবর্তন।	শিখন সম্পূর্ণভাবেই মানসিক প্রক্রিয়া। প্রকাশ্য আচরণ মানসিক প্রক্রিয়ারই ফল।
▪ শিখন কীভাবে হয়?	
উদ্দীপক ও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সংযোগ করতে পারার মাধ্যমে।	শিখনের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কটি সংগঠিত নক্সা হিসাবে বুঝতে পারার মাধ্যমে।

■ শিখনের প্রক্রিয়াটি কী?	
পাভলভের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাহায্যে অনুবর্তিত উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থায়ী করার মাধ্যমে। স্কিনারের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া প্রবলক হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ প্রবলন প্রক্রিয়াই শিখনের মূল ভিত্তি।	অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপরে উল্লেখ করা সংগঠিত নক্সা বা প্রতিরূপটি অনুভব করার প্রক্রিয়া।
■ শিক্ষকের ভূমিকা কী?	
উপযুক্ত প্রবলক নির্বাচন করে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলা এবং শিক্ষার্থীকে তাৎ-ক্ষনিকভাবে তার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে প্রতিসংকেত দেওয়া।	যথাসম্ভব শিখনের উপাদানগুলির সামগ্রিক রূপটি শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা এবং তাকে ঐ রূপটি আবিস্কার করতে সাহায্য করা।
■ শিক্ষার্থীর ভূমিকা কী?	
শিক্ষার্থীর কাজ শুধু শিক্ষকের দেওয়া উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া করা।	স্বাধীনভাবে নিজের মত করে সমগ্র রূপটি অনুধাবন বা আবিস্কার করার চেষ্টা করা।

২.৫ শিখনের প্রজ্ঞাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Cognitive views of Learning)

পাভলভ ও স্কিনার প্রকাশ্য আচরণ পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচরণবাদী মত (Behaviouristic view) বলা হয়। কিন্তু কোয়েলারের মত অনুযায়ী শিখনের ফলে যে মানসিক সংগঠনের পরিবর্তন ঘটে তার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাইরের জগৎকে জানার জন্য অন্যান্য যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া আছে, যেমন, প্রত্যক্ষণ (দেখা, শোনা, স্বাদগ্রহণ করা ইত্যাদি), মনোযোগ (মনোযোগ না দিলে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটিতে যে সংগঠিত রূপটি আছে তা আবিস্কার করা সম্ভব নয়), স্মৃতি (সংগঠনের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) ইত্যাদি, তাদেরও বিশেষ কার্যকারিতা রয়েছে। এই কারণে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হয় প্রজ্ঞাবাদী মত। **এখানে জ্ঞান (Knowledge) অর্থ স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য। আর প্রজ্ঞা শব্দটির অর্থ জ্ঞানের সংগঠিত জটিল রূপটি**। কিন্তু কোয়েলার শিখনের বিশেষত অন্তর্দৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা প্রজ্ঞাবাদের সূচনা করেছিল মাত্র। প্রকৃত প্রজ্ঞাবাদী মতবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা আরও পরবর্তীকালে হয়েছিল এবং এইসব পরীক্ষা সরাসরি মানুষের উপর করা হয়, কোন পশুপাখির উপর নয়। কারণ পরবর্তীকালের মনোবিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন যে পশুপাখির বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির এতই পার্থক্য, মানুষের

মানসিক ক্রিয়া এতটাই জটিল যে পাখির সরল প্রতিক্রিয়া বা আচরণ মানুষের শিখন প্রণালীর খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এখানে তিনজন প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

২.৫.১ জাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget)

প্রকৃতপক্ষে পিঁয়াজেঁ সরাসরি শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেননি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে জানার চেষ্টা করেছেন, জন্মের পর থেকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি শিশু কীভাবে তাঁর চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই জানার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও পরিবর্তন হয় কি না। এই অর্থে তাঁর মতকে শিখনের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবেও ব্যাখ্যা করা চলে।

প্রথমে জানা দরকার এই জাতীয় মতবাদের মূল ভিত্তিটি কী?

মনে করুন আপনি পথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, চলতে চলতে কত কিছু আপনার চোখে পড়ছে, মানুষ, প্রাণি, যানবাহন, নানাবস্তু ইত্যাদি। আবার কত শব্দও আপনার কানে আছড়ে পড়ছে। নাকে কতরকম গন্ধ আসছে, শরীরের চামড়ায় রোদ বা ছায়ায় কখনও গরম বা ঠান্ডার অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি আপনি সবকিছু দেখছেন বা শুনছেন? সবকিছু মুহূর্তের জন্য আপনার ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপনা সৃষ্টি করে আবার পরক্ষণেই সরে যাচ্ছে, আপনিও তার কথা ভুলে যাচ্ছেন।

কিন্তু যদি কোনও কিছুর প্রতি আপনি মনোযোগ দেন, তবে সেটি ভালো করে দেখা বা শোনার দরুন কিছুটা বেশি সময় মনে থাকে। তার মধ্যেও কোন কোনটি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে। এই যে বাছাই করা কিছু বিষয় দীর্ঘকাল ধরে স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রক্রিয়া এটাই আমাদের শিখনের ভিত্তি। **মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বাইরে থেকে যতকিছু উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে সাড়া জাগায় তাই হল তথ্য (Information)**।

এইভাবে দেখলে, **শিখন কথাটির অর্থ কোন বিশেষ তথ্য বাছাই করে স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রক্রিয়া**। কিন্তু প্রশ্ন হল কীভাবে এই বাছাই করা বা সংরক্ষণ করার কাজটি সম্পন্ন হয়।

আপনি একটি ছোট্ট সহজ গল্প বই থেকে পড়ে যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে গল্পটি বলেন তবে দেখা যাবে পড়া গল্প আর বলা গল্পের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ঘটে গেছে। পড়তে যত সময় লেগেছিল বা গল্পটি যতটা দীর্ঘ ছিল, বলার সময় তা ছোট হয়ে গেছে, সময় লেগেছে কম। অর্থাৎ আপনার স্মৃতিতে মূল গল্পটি ঠিকই আছে কিন্তু অনেক ছোটখাট বর্ণনা বাদ চলে গেছে অবার বলার ধরণটিও আপনার নিজস্ব, লেখকের মত নয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

- যে তথ্য আমরা গ্রহণ করি স্মৃতিতে ধরে রাখার সময় তা অবিকল একরকম থাকে না। নিজের মত করে তাকে পরিবর্তন করে নিই। একে বলা হয় **তথ্যের জারণ (Information Processing)**।
- সংরক্ষিত তথ্যের মূল কাঠামো ঠিক থাকে কিন্তু অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ যায়।
- একই ধরণের আর একটি তথ্য যদি আগে থেকে সংরক্ষিত থাকে তবে নতুন তথ্যটি মনে পড়লে সেটিও মনে পড়ে। অর্থাৎ একই ধরণের তথ্য জারণের পর একত্রে সংগঠিত হয়ে স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে।
- নতুন তথ্য সব সময়ই জারণ করা হয় পুরানো অভিজ্ঞতার (সংরক্ষিত তথ্য) আলোকে।

পিঁয়াজে জন্মের পর থেকে কীভাবে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করি তার প্রক্রিয়াকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ এক একটি স্তরের শিখন প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কিত হলেও কিছুটা ভিন্নরকম ও পূর্ববর্তী স্তরের শিখন প্রক্রিয়া থেকে উন্নততর।

পিঁয়াজের মূল ধারণা – তিনি কয়েকটি মূল ধারণার সাহায্যে তাঁর মতটি ব্যাখ্যা করেছেন।

স্কিমা (Schema) – পিঁয়াজে মনে করেন, আমরা যা কিছু শিখি তা এলোমেলো বা অগোছালোভাবে আমাদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে না। কোন অফিসে যেমন প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর আলাদা আলাদা ফাইল থাকে এবং প্রত্যেকটি ফাইলের এক একটি নাম দেওয়া থাকে তেমনি কোন কিছু শেখা হলে তা একটি নির্দিষ্ট নাম যুক্ত তথ্যভান্ডারে সঞ্চিত থাকে। আবার অফিসে ফাইলগুলির শ্রেণিবিভাগ করা থাকে এমনভাবে যে কোন একটি ফাইল দরকার হলে তা সহজেই খুঁজে বের করা যায়। একটি গ্রন্থাগারের বইগুলিও একই নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। মনে করা যাক কোন শিশু জীবনে প্রথম হাতি দেখেছে। হাতির বিশাল চেহারা, শুঁড়, মোটা মোটা থামের মত পা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য মিলে হাতি সম্বন্ধে তার যে ধারণা স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকল, পিয়াজেঁ তাকে বলেছে স্কিমা (Schema)। অর্থাৎ **স্কিমা হল অনেকগুলি সম্পর্কিত তথ্য যা একটি সাধারণ নাম দিয়ে প্রকাশ করা যায়**। পরবর্তীকালে হাতি সম্বন্ধে যত নতুন নতুন বিষয় জানতে পারবে তার সবই একই স্কিমার অন্তর্ভূক্ত করে নেবে। এইভাবে হাতি বিষয়ক স্কিমা ক্রমাগতই প্রসারিত হতে থাকবে। পিয়াজেঁর মতে **স্কিমার পরিবর্তন বা প্রসারণই শিখন**।

মনে করা যাক উপরোক্ত শিশুটির বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। তার অভিজ্ঞতায় প্রতি বছর হাতি পাহাড় থেকে নেমে এসে ফসল নষ্ট করে, দুই একজনকে মেরেও ফেলে, এইসব স্বাভাবিক ঘটনা। আর একটি শিশুর বাড়ি হয়ত আসামে। সে দেখেছে হাতি ভারি ভারি কাঠ টেনে আনে ও আরও নানারকম কাজ করে দেয়। হাতি সম্বন্ধে এই দুই শিশুর স্কিমা কিছুটা মিল থাকলেও অনেকটাই আলাদা। এই কারণেই বলা হয় প্রত্যেকের স্কিমা তার নিজস্ব। এই কারণেই ক্লাসে আপনি যা শিখিয়েছেন দুজন ছাত্র তা দুরকমভাবে বলবে – হুবহু একরকমের নয়।

আত্তীকরণ (Assimilation) – এই কথাটির অর্থ শিক্ষনীয় তথ্যটিকে পরিবর্তিত করে তাকে স্কিমার অন্তর্ভূক্ত করার উপযোগী করে নেওয়া। তথ্য জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে নতুন

তথ্যের আত্তীকরণ করে। খাদ্যপরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে এর মিল আছে। খাদ্য খাওয়ার পর তা যেমন নানা উৎসেচকের (Enzyme) প্রভাবে ক্রমশ একটি সরলতর রূপে পরিবর্তিত হয় এবং কোষ কলাগুলিতে শোষিত হয়, তেমনি তথ্যের সরলতম রূপটিই স্কিমার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

অন্তর্ভূক্তিকরণ (Accommodation) – কোন নতুন তথ্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত স্কিমার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য স্কিমার গঠনটির মধ্যেও কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার হয়। একে বলা হয় অন্তর্ভূক্তিকরণ। কোন ব্যক্তির যদি খাদ্যের চাহিদা (ক্ষুধা) না থাকে তবে খাবার খেলেও তার আত্তীকরণ হবে না। তেমনি কোন শিক্ষার্থীর যদি নতুন তথ্য গ্রহণ করার চাহিদা না থাকে তবে তা নির্দিষ্ট স্কিমার অন্তর্ভূক্ত হবে না। অর্থাৎ এক কথায় শিখন হবে না।

শিখন প্রক্রিয়ার চারটি স্তর – পিয়াজেঁ যে চারটি স্তরের কথা বলেছেন তার প্রথমটি হল, **সংবেদন-সঞ্চালন স্তর (Sensori-motor stage)**।

সংবেদন-সঞ্চালন স্তর

জন্মের পর থেকে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা শুধু এই পদ্ধতিতেই শেখে। এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে, তার প্রথমটি হল সংবেদন অর্থাৎ চোখ দিয়ে দেখে, কানে শুনে, স্বাদ গ্রহণ করে, গন্ধ ও স্পর্শের মাধ্যমে তার চারপাশের যত ব্যক্তি প্রাণি বা বস্তু আছে সে সম্বন্ধে স্কিমা গঠন করে। একটি টম্যাটো লাল, গোলাকার, মসৃণ, টক স্বাদযুক্ত। এইসব বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে টম্যাটো সম্বন্ধে তার স্কিমা তৈরি হয়। দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে সঞ্চালন, অর্থাৎ হাত, পা ইত্যাদি চালনা করে যে সব ধারণা গঠন করা যায় তাই। টম্যাটো গোলাকার ঠিকই কিন্তু তা শুধুমাত্র চোখ দিয়ে দেখেই বোঝা যায় না, সেই সঙ্গে হাত দিয়ে টম্যাটোকে ধরলে, চোখ বন্ধ করেও আমরা বলতে পারি সেটি গোলাকার। হাতের আঙুলগুলির সঞ্চালন ও চোখের দেখা এই দুই অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়ে গোলাকার টম্যাটোর স্কিমা গঠিত হয়। এই কারণেই একে বলা হয়েছে সংবেদন-সঞ্চালন স্তর।

পিঁয়াজে এই স্তরের শিশুদের স্কিমা গঠন প্রসঙ্গে দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এই স্তরকে কয়েকটি উপস্তরে ভাগ করেছেন। কিন্তু সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। এই বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়ে পড়তে আসার প্রশ্ন নেই। শুধু এই স্তরের বিকাশ যাতে ঠিকঠিক হয় তার জন্য কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা ভালো।

- এই বয়সের শিশুদের নানা আকারের ও রঙের জিনিষপত্র, খেলনা স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেওয়া দরকার।
- তারা যাতে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে এবং ইচ্ছামত সবকিছু হাতে নিয়ে দেখতে পারে তার যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া দরকার।
- ছবির চেয়েও সরাসরি বাইরের চারপাশের বস্তু, প্রাণি, গাছপালা দেখার সুযোগ করে দেওয়া দরকার।

প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage)

দ্বিতীয় স্তরটির নাম প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage)। দুই বৎসরের পর থেকে ছয় বৎসর

বয়স পর্যন্ত এই স্তরের স্থায়ীত্ব। এই স্তরে সংবেদন-সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার পাশাপাশি আরও নতুন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়। এখানে সক্রিয়তা শব্দটির অর্থ শারীরিক কর্মচঞ্চলতা নয়, মানসিক সক্রিয়তা। অর্থাৎ এই পর্যায় থেকে শিশুরা যা দেখেছে, বা যা সঞ্চালন ক্রিয়ার সাহায্যে শিখেছে তার একটি মানসিক প্রতিরূপ তৈরি করতে শুরু করে। এই বয়সে তাদের কথা বলা ও ভাষাবোধের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। সুতরাং স্কিমার মানসিক প্রতিরূপটিতে নতুন নতুন তথ্য যুক্ত হয়ে দ্রুত তার প্রসারণ ঘটে। কিন্তু বাইরের জগৎকে সে বড়দের মত যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিচার করে না। তার চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হল।

- এই প্রথম শিশু তার কল্পনার জগৎ ও বাস্তব জগৎকে আলাদা করে।
- কিন্তু এই বয়সে তার চারপাশের পুতুল, আসবাব, গাছপালা সবই তার কাছে সজীব কথা বলা প্রাণি।
- এই সময় তার যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ নিজস্ব। যেমন, রাত্রির পর **সকাল** হয় কারণ পাখিরা ডাকে।
- ছোট বড়, কম বেশি ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা একটা মাত্র তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন, যে লম্বা সে বড়, যার চুল পাকা সে দাদু ইত্যাদি।
- আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা বেশি থাকে। সে মনে করে সবকিছুই তাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। আমি, আমার এই জাতীয় কথা বেশি ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়।
- এদের চিন্তা একমুখি। ক থেকে খ বড়, কিন্তু এর বিপরীতভাবে খ থেকে ক ছোট বলতে পারে না।

এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় কাজে লাগানো যেতে পারে।

- এরা নার্সারি বা কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে ফিরে শিক্ষিকার অনুকরণে স্কুল স্কুল খেলতে ভালোবাসে।
- খেলার সময় নানারকমভাবে বাস্তবের অনুকরণ করতে পারে। যেমন, খাওয়া বা ঘুমের ভান করা।
- ছবি আঁকার ঝোঁক দেখা যায়।
- ভাষা এদের চিন্তার বাহন। যা করে বা ভাবে তা মুখে বলতে বলতে করে।
- সবকিছুর একটা মানসিক ছবি আঁকতে চেষ্টা করে।

এই সব কারণে এদের শেখানোর জন্য উজ্জ্বল ছবি, নাচ-গান সহ ছড়া, আবৃত্তির মাধ্যমে নতুন তথ্য দেওয়া ইত্যাদি বিশেষ কার্যকর। তাছাড়া সংবেদন সঞ্চালন স্তরের উপযোগী অভিজ্ঞতালাভের সুযোগও থাকা দরকার।

মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete operational stage)

এটি তৃতীয় স্তর। এর স্থায়ীত্বকাল ৭ – ১১ বৎসর। এই সময়ে শিশুদের মানুসিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ যুক্তি নির্ভর না হলেও তার ভিত্তি তৈরি হয়। তারা শ্রেণিবিভাগ করতে শেখে। যে সব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয়

সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। সেই সঙ্গে ক্রমশ উপলব্ধি করে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই বস্তু একাধিক শ্রেণির অন্তর্গত হতে পারে। যেমন, একই মানুষ কারও বাবা কিন্তু অন্য একজনের ভাই হতে পারে। এই সময়ে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা, গণনার জন্য সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান, সংখ্যার সংযোজন ও বিয়োজন সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতায় ভিত্তিতে তার শেখা হয়ে যায়। এই কারণে এই বয়সের শিশুদের (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স) গণিতের মৌলিক নিয়মগুলি যেমন, যোগ, বিয়োগ গুণ, ভাগ শেখানো হয়। স্থান সম্বন্ধেও তাদের বিমূর্ত মানসিক প্রতিরূপ তৈরি হয়। সেজন্য কিছু কিছু স্থানীয় ভৌগোলিক শিক্ষা এদের উপযোগী।

তবে যাই শিখুক, বা যাই শেখানো হোক প্রথম প্রথম তার একটি বাস্তব বা মূর্তরূপ থাকা দরকার। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তার মানসিক প্রতিরূপটি তৈরি হয়। যোগ বিয়োগ শেখানোর জন্য এই কারণেই প্রথমে সংখ্যার পরিবর্তে পুঁতি, মার্বেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এরা অংশ ও সম্পূর্ণ বস্তুর পার্থক্য বুঝতে পারে এবং দুটি বা তিনটি ভাঙ্গা অংশ একত্রে যুক্ত হলে যে একটি সম্পূর্ণ জিনিস হয় সেই বোধ এদের মধ্যে তৈরি হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকরা কয়েকটি নীতি অনুসরণ করলে এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করা সহজ ও কার্যকর হবে।

- ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো দরকার।
- বই থেকে নয়, প্রকৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখানো সহজ।
- বাস্তব (মূর্ত) থেকে ক্রমশ যুক্তিনির্ভর (বিমূর্ত) ও মানসিক প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে স্কিমার গঠন প্রসারিত হবে।
- শ্রেণিবিভাগ করতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা দরকার। নানাভাবে শ্রেণিবিভাজন, যুক্তির বিকাশে সাহায্য করে।
- নিজের গ্রাম, অঞ্চল ইত্যাদি ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে শেখান। এর ফলে তাদের স্থানিক প্রত্যক্ষণ ও ধারণা গঠন সহজ হবে।
- বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে পড়ানো দরকার।
- শেখানোর চেয়ে নিজে শেখায় উৎসাহ দিতে হবে।
- যতদূর সম্ভব হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে, নিজের উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করে শেখায় উৎসাহ দিতে হবে।

যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal Operational Stage)

পিঁয়াজের তত্ত্বে চতুর্থ স্তরটির নাম যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর। এর শুরু ১১- ১২ বৎসর বয়সে এবং সমগ্র কৈশোর কাল যাবৎ এর বিকাশ হয়। এই সময় ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর শিখনে অভ্যস্ত হতে থাকে। যদি পূর্ববর্তী তিনটি স্তরের শিখন প্রক্রিয়া যথাযথ হয়ে থাকে তবে তারা এই সময় বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যম অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে সচেষ্ট হয়। এই কারণে সপ্তম শ্রেণির পর থেকে পাঠ্য বিষয়ে ক্রমশ বেশি

করে বিমূর্ত চিন্তা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন, বীজগণিত পাঠের সূত্রপাত, জ্যামিতিক উপপাদ্যের যুক্তি নির্ভর প্রমাণ, কবিতার মর্ম ও সৌন্দর্য বিচার, প্রবন্ধের মাধ্যমে কোন বিমূর্ত বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি পাঠক্রমে স্থান করে নেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে পূর্ববর্তী তিনটি স্তরের শিখন প্রক্রিয়া কখনই লোপ পায় না।

পিঁয়াজের তত্ত্ব যদিও আমাদের বৌদ্ধিক বিকাশ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়েছিল তবুও শিশুদের শিখন প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে এর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই ক্লাসের শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনায় পিঁয়াজের চিন্তাধারা প্রয়োগ করা একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ৩ (Check Your Progress – 3)

নির্দেশ ঃ ক) আপনার উত্তর নিচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) স্কিমা কাকে বলে?

২) পিয়াজেঁর তত্ত্ব অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ার চারটি স্তরের নাম লিখুন।

৩) তথ্য জারণ বলতে কী বোঝায়?

৪) মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণা গঠন কোন স্তরের বৈশিষ্ট্য?

৫) একই বস্তু সম্বন্ধে গঠিত স্কিমা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা বা তার নিজস্ব ধরনের হয় কেন?

____

____

____

____

৬) যৌক্তিক সক্রিয়তা স্তরের শিক্ষার্থীদের যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

____

____

____

____

২.৫.২ জেরোম ব্রুণার (Jerome Bruner)

আধুনিক শিখন ও শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যাঁরা প্রচুর গবেষণা এবং বিশেষ কার্যকর তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, ব্রুণার তাঁদের অন্যতম। তিনি মনে করেন ছোট থেকেই মানুষ তার চারপাশের জগৎকে প্রতিনিয়ত আবিস্কার করে চলে। এর ফলে একজন মানুষের জ্ঞান অন্য একজন মানুষের জ্ঞানের হুবহু জেরক্স কপি নয়, একই পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ করা হলেও নয়। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের তিন ধরনের ধারণা তৈরি হয়।

- কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে তার একটি নাম দেওয়া। যেমন, কুকুর একটি ধারণা। এর মধ্যে **কুকুরের** ডাক, চেহারা, হাঁটা, স্বভাব ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমশ যুক্ত হয়। এই প্রকার ধারণার নাম **সংযোজক ধারণা**।
- আবার নানা প্রজাতির **কুকুরের** মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। সব প্রজাতির কুকুরই একই সাধারণ নামে পরিচিত। অথচ, এ্যালসেশিয়ান, ডোবারম্যান, হাউন্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির কুকুরের **চেহারা** স্বভাব অনেক কিছুই আলাদা। সেজন্য এইগুলিকে ব্রুণার বলেছেন **বিয়োজক ধারণা**।
- আবার কিছু কিছু ধারণা আছে যাদের বৈশিষ্ট্যগুলি এত স্পষ্ট নয়। তারা পরস্পর থেকে একেবারে আলাদা নয়। যেমন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা হয় ঠিক কিন্তু সর্বত্র এদের প্রকৃতি একরকম নয়। তাছাড়া একটি গ্রাম ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং গ্রাম, শহর, এগুলি **সম্পর্কমূলক ধারণা**।

ব্রুণারের মতে শিখন কথার অর্থ এই সব ধারণা আয়ত্ত করা (Concept attainment) এবং যার পদ্ধতি হল অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য ধারণা আবিস্কার বা উদ্ভাবন। শিক্ষকের কাজ হল ধারণা আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদান সরবরাহ করা এবং আরও নতুন তথ্য সংগ্রহে উৎসাহিত করা।

ব্রুণারের পরীক্ষায় দেখা গেছে **শিখনের তিনটি স্তর আছে। তার প্রথমটি হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শেখার স্তর।** দেখে (পাখির চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি), শুনে (পাখির ডাক) বা অন্যান্য ক্ষেত্রে স্পর্শ করে, গন্ধ বা স্বাদগ্রহণ করে প্রাণি বা বস্তুর ধারণা গঠন করা। **দ্বিতীয় স্তর হল সক্রিয়তার স্তর।** অর্থাৎ কোন কাজ করে তার ভিত্তিতে শেখা। যেমন, ভারি ও হাল্কা এই ধারণা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না। কোন জিনিষ হাত দিয়ে তুললে ভারি বা হাল্কা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হতে পারে। তেমনি, দূর বা নিকট এই বিষয়টিও শিশু বা শুধুমাত্র চোখে দেখে শেখেনা। হেঁটে কাছে গিয়ে দূরত্ববোধ তৈরি হয়। **তৃতীয় স্তরে আছে প্রতীকের মাধ্যমে ধারণা গঠন।** যেমন, পাঁচটি বলের মধ্যে দুটি সরিয়ে নিলে তিনটি থাকে। এই বিষয়টি ইন্দ্রিয় ও সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখা হলে, আর সত্যিসত্যিই বলের দরকার হয় না। পাঁচ, তিন, দুই এই সবের প্রতীক চিহ্নই যথেষ্ট।

ব্রুণারের পদ্ধতির প্রয়োগ

ব্রুণারের পদ্ধতি অনুযায়ী ধারণা আয়ত্ত **করার** জন্য শিক্ষকরা কয়েকটি ধাপে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করতে পারেন। মনে রাখতে হবে ব্রুণারের পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা শুধুমাত্র সহায়ক এবং আয়োজকের। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আবিস্কার করতে শিখবে।

নাম – প্রথমে একটি নাম দিয়ে শুরু করুন। যেমন, (উদ্ভিদের) পাতা।

- **উদাহরণ** – ছাত্রছাত্রীদের নানারকম পাতার উদাহরণ দিতে বলুন। স্বভাবতই তারা চারপাশে যত পাতা দেখতে পায় সেগুলিরই নাম বলবে। যেমন, আম, জাম, বট, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি।
- **নমুনা সংগ্রহ** – তাদের বলুন নানারকম পাতার একটি করে নমুনা সংগ্রহ করে আনতে।
- **শ্রেণিবিভাগ** – নমুনাগুলিকে নানারকম শ্রেণিতে সাজাতে বলুন। কীসের ভিত্তিতে সাজানো হবে প্রাথমিকভাবে তারাই স্থির করবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক সাহায্য করবেন।
- **বৈশিষ্ট্য নিরূপন** – পাতাগুলির বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত করে তার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে বলুন।
- **বিবরণ লিপিবদ্ধ করা** – এবার এক একটি শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ তারা লিখতে চেষ্টা করবে। যেমন, যৌগিক পাতা, সরল পাতা ইত্যাদি।

এই কাজগুলির ভার দলগতভাবে দিলে তা আরও কার্যকর হয়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক করে সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে।

২.৫.৩ ডেভিড অসুবেল (David Ausubel)

ডেভিড অসুবেলের মত অনুযায়ী প্রকৃত শিখন হল অর্থবহ শিখন (Meaningful learning)। অর্থবহ শিখন বলতে তিনি মনে করেন, আমাদের যা জানা আছে তার সঙ্গে নতুন অজ্ঞাত তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন জ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলা। তাঁর বক্তব্য বোঝানোর জন্য তিনি তিনরকম শিখনের কথা বলেছেন।

- **গ্রহণজনিত শিখন –** আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যা দেখি বা শুনি সরাসরি তাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সংরক্ষণ করি। এইটি শিখনের প্রাথমিক পর্যায় কিন্তু শিখনের স্থায়ী প্রক্রিয়া নয়।

- **বোধহীন শিখন –** কোন কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার পর আমরা দুটি কাজ করতে পারি। এক যে তথ্য গ্রহণ করেছি তাকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন, ছোটবেলায় শেখা অক্ষরগুলি, ক, খ, গ ইত্যাদি আমরা অবিকৃতভাবে সঞ্চয় করে রেখেছি। এইটি শিখনের দ্বিতীয় পর্যায় যা না হলে অর্থবহ শিখন হবে না। যেমন, ক, খ ইত্যাদি অক্ষরগুলি মনে না রাখলে শব্দ, বাক্য ইত্যা পিড়া ও শেখা সম্ভব হবে না।

- **অর্থবহ শিখন –** সংরক্ষিত তথ্যের সঙ্গো নতুন তথ্য মিলিয়ে না নিলে তা অর্থবহ হয় না। যেমন, একটি নতুন প্রাণি দেখলে প্রথমেই আমরা মিলিয়ে দেখি এরকম প্রাণি আমি আগে দেখেছি কি না। যদি দেখা যায় প্রাণিটি আমার পূর্বে দেখা বানরের মত অনেকটা একরকম। কিন্তু কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত করি এটিও আরেক রকমের বানর। হয়ত কেউ বলে দিল এর নাম বেবুন। তখন, আমাদের নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গো নামটিও যুক্ত হয়ে গেল।

গ্রহণ জনিত শিখন ও বোধহীন শিখন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু অর্থবহ শিখনের স্থায়ীত্ব অনেক বেশি। সেজন্য অসুবেল শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, শিক্ষার্থীরা কী কী জানে সে বিষয়ে আগে নিশ্চিত হোন, তারপর সেই অনুযায়ী তাদের নতুন কিছু শেখান। অর্থাৎ সরাসরি শিক্ষকের কাজ হল ছাত্রছাত্রীরা যা জানে সেটাকে উদ্দীপিত করে, তাদের উৎসাহিত করা, যেন নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে তারা সর্বদা সচেতনভাবে সচেষ্ট থাকে।

এই উদ্দেশ্যে অসুবেল তাঁর পদ্ধতিকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করেছেন।

- প্রথম ধাপে যে বিষয়টি শেখানো হবে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত (দুই একটি বাক্যে) কিন্তু সম্পূর্ণ রূপটি তুলে ধরুন। একে অসুবেল বলছেন অগ্রিম সংগঠক। কারণ অগ্রিম সংগঠক উপস্থিত করা হলে সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যা জানে তা একত্রিত করে তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করবে।
- অগ্রিম সংগঠকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ধারণাটি তুলে ধরলে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তথ্যগুলির বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবে শিক্ষার্থী।
- তাকে ঐ বিচার বিশ্লেষণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি নতুন তথ্যগুলিও যাচাই করে নিতে সাহায্য করা হবে।
- এর থেকে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিকল্প সিদ্ধান্তগুলির তুলনামূলক বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে **উদ্বুদ্ধ** করতে হবে।
- গৃহীত সিদ্ধান্ত অগ্রিম সংগঠকের সঙ্গো মিলিয়ে নিয়ে একটি স্থায়ী সংগঠকে পরিণত হবে।
- এরপর যুক্তিপ্রয়োগ করে অনুরূপ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

যেমন, বর্ষজীবী উদ্ভিদ একবার ফল দিয়েই মরে যায়। এটি একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত। মটরগাছ যেহেতু বর্ষজীবী, অতএব একটি মটরগাছ থেকে এক বছরে একবারই ফল পাওয়া যাবে। অথবা যেহেতু মটরগাছ একবার ফল দিয়েই মরে যায় অতএব মটরগাছ বর্ষজীবী।

২.৬ শিখনের নির্মিতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Constructivist View of Learning)

ব্রুণার ও অসুবেলের পদ্ধতি থেকে পরিস্কার বোঝা যায় তাঁরাও নির্মিতিবাদী শিক্ষামনোবিজ্ঞানী। তাঁদের নির্মিতিবাদকে বলা হয় প্রজ্ঞার নির্মিতিবাদ (Cognitive constructivism) কারণ তারা জ্ঞানের সংগঠন নিয়ে বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন শিখনের ক্ষেত্রে সামাজিক পটভূমি ও অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তাঁদের মতবাদকে বলা হয় সামাজিক নির্মিতিবাদ (Social constructivism)। এইরকম একজন মনোবিজ্ঞানীর নাম বাইগট্স্কি (Lev Vygotsky)

২.৬.১ বাইগট্স্কির সামাজিক নির্মিতিবাদ (Social Constructivism of Vygotsky)

বাইগট্স্কিকে সরাসরি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী বলা যায় কি না সে বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ আছে। কিন্তু তিনি শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশ এবং ভাষা ও বাচনিক বিকাশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। সেই সূত্রে শিখনের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা পরোক্ষ কিন্তু উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। বাইগট্স্কির মূল বক্তব্য বিষয় শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় এবং তা যথেস্ট সুফলও দিতে পারে।

শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের ভিত্তি হিসাবে বাইগট্স্কি সামাজিক আদানপ্রদান ও কৃষ্টির ভূমিকাকে প্রধান বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন বৌদ্ধিক বিকাশের **দুটি ভিত্তি আছে।**

- **জৈবিক ভিত্তি** – যেমন, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ।
- **সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ভিত্তি** – উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া, যা জৈবিক ভিত্তির কার্যকারিতা ও প্রকাশের জন্য আবশ্যক। যেমন, মস্তিষ্কের বিকাশের উপর নির্ভর করে শিশু কখন কীধরনের কথা বলবে। কিন্তু যে সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক পরিমন্ডলে সে বড় হয় তা স্থির করে দেয় তার ভাষার প্রকৃতি।

বাইগট্স্কির বিকাশমূলক চিন্তাধারা – একটি শিশু কথা বলতে শেখার আগে নানারকম শব্দ করে। তারপর একসময় প্রথম কথাটি বলতে শেখে। বাইগট্স্কি মনে করেন এই পরিবর্তনগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জৈবিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে সামাজিক (পারিবারিক) পরিবেশ অনুযায়ী এই পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি স্থির হয় যা প্রকৃত পক্ষে একটি ক্রমিক ও ধারাবাহিক রূপান্তর। পরিবারে যে স্তরের ভাষা ব্যবহার করা হয় শিশুও সেইগুলিই আয়ত্ত করে। এর কারণ তার সঙ্গে এবং তার চারপাশের মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময় করার ভাষা এক একটি পরিবেশে আলাদা।

বাইগট্স্কি মনে করেন অন্যরা যখন নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করে, বা শিশুর সঙ্গো কথা বলে তা শুধুমাত্র একটি ভাষার আদানপ্রদান নয়, সামাজিক আদান প্রদানও। সামাজিক আদান প্রদান, ভাববিনিময় ভাষা বিনিময়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেজন্য শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে এই আন্তর্ব্যক্তিক সামাজিক আদান প্রদান ছাড়া তার অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়।

আবার সেই সঙ্গো এই ভাব বিনিময়ের পাশাপাশি নিজের সঙ্গো নিজে মনে মনে একধরণের কথোপকথন করে নেয়। এর ফলে ভাষার আত্তীকরণ হয় এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক হয়। এই আভ্যন্তরীন বাক্য বিনিময় একই সঙ্গো চিন্তা, যুক্তি ও ভাষাকে পরিপুষ্ট করে।

শিখন ও বিকাশের সম্পর্ক – বাইগট্স্কি মনে করেন, শিখন প্রক্রিয়া তার বিকাশের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। সাধারণত বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে কোন একটি সময়ে শিশুর বিকাশের মানটি স্থির করা যায়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যে শিশুটির বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q) ১০৫ তাকে তার উপযোগী বিষয়গুলিই শেখানো হয়। কিন্তু বাইগট্স্কি মনে করেন, শিক্ষকগণ চেষ্টা করলেই তাকে আরও একটু অগ্রবর্তী করে তুলতে পারেন। যে সমাজে একটি শিশু শুধুমাত্র গণনা করতে শিখেছে একটু ভিন্ন পরিবেশে আর একজন হয়তো যোগ করা শিখে ফেলে। যদিও উভয়ের বিকাশের মান একই। বিকাশের স্তর এইভাবে কতটা পর্যন্ত উন্নতি করা যেতে পারে বাইগট্স্কি তাকে বলেছেন **সন্নিহিত বিকাশের সীমা (Zone of Proximal Development)**।

উদাহরণ – কোন উপজাতি গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষক হয়ত মনে করলেন তার বিকাশের স্তর অপেক্ষাকৃত নিম্ন। সুতরাং তার পক্ষে ক্লাসের পড়ার ক্ষেত্রে সে একটু পিছিয়ে থাকবেই। কিন্তু বাইগট্স্কির মত অনুযায়ী, তার সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিবেশকে বিচার করে যদি তার বিকাশের স্তর ঠিক করা হয় তবে শিক্ষক সঠিকভাবে স্থির করতে পারবেন তাকে আরও কতটা অগ্রবর্তী স্তরে উন্নীত করা যাবে (সন্নিহিত বিকাশের সীমা)।

বাইগট্স্কির আর একটি ধারণা সন্নিহিত বিকাশের সীমার সঙ্গো যুক্ত। শিক্ষক যদি স্থির করতে পারেন একটি ছাত্রের বর্তমান বিকাশের স্তর থেকে সম্ভাব্য উন্নয়ন কতটা তবে তার জন্য যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া দরকার সেটাও স্থির করে নিতে পারেন। একে বাইগট্স্কি বলেছেন **সহায়তা দান (Scaffolding)**। উপরের উদাহরণে যে শিক্ষার্থীর কথা বলা হয়েছে তাকে যে ধরণের সহায়তা **দান** করতে হবে সেটা নির্ভর করবে তার সামাজিক ও কৃষ্টিগত অবস্থানের উপর। অর্থাৎ একই ধরনের সহায়তা সমস্ত ছাত্রছাত্রীর উপযোগী নয় কারণ তাদের ধাত্রী সমাজ একরকম নয়।

এছাড়াও, বাইগট্স্কি মনে করেন ক্লাসের বাইরে সহপাঠীদের পারস্পরিক মেলামেশা ও সামাজিক আদান প্রদান শিখন ও বিকাশের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এই ধরনের আদান প্রদান পরস্পরের সন্নিহিত বিকাশের সীমাকে প্রসারিত করে এবং শিখন স্বাভাবিক ও সহজ সাধ্য হয়।

বাইগট্স্কির তত্ত্বের প্রয়োগ – শিক্ষকরা বাইটগস্কির তত্ত্বকে কীভাবে প্রয়োগ করবেন, তার কয়েকটি সাধারণ ধাপ নিচে দেওয়া হল।

- শিক্ষার্থীদের বর্তমান শিখনের স্তরটি জানুন। তারা কতটা শিখেছে এবং তাদের বিকাশের স্তরটি কোন পর্যায়ে আছে সেটা স্থির করুন। যেমন, সাত বছরের একটি ছেলে বা মেয়ে ভারি ও হাল্কা শব্দদুটির অর্থ বোঝে। হাত দিয়ে তুলে মোটামুটি ভারি হাল্কার পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু একটা ছোট জিনিস যে কখনও কখনও বড় জিনিসের থেকে ভারি হতে পারে সেটা বোঝে না।
- তাদের জন্য সম্ভাব্য সন্নিহিত বিকাশের সীমা স্থির করুন। উপরোক্ত উদাহরণে শিক্ষক মনে করলেন তাকে এটা শেখানো সম্ভব যে ভারি বা হাল্কা ছোট বা বড় আকারের উপর নির্ভর করেনা কিন্তু ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়।
- কীধরণের সহায়তা এর জন্য প্রয়োজন তা স্থির করুন। যেমন, নানারকম জিনিসের ওজন করার অভিজ্ঞতা, দাঁড়িপাল্লার যেদিকে ভারি জিনিস চাপানো হয় সেদিকটা নিচে নেমে যায়। এই অভিজ্ঞতা, দোকান থেকে জিনিস কেনার অভিজ্ঞতা, এসবের একত্র সমাহার থেকে বস্তুর ওজন সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ করে দেওয়া যায়। চাক্ষুষ পরিমাপের সঙ্গে ওজনের তুলনা করায় উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।
- সামাজিক আদান প্রদানে উৎসাহ দিন। একথার অর্থ ছেলেমেয়েরা নিজেদের অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে করতে মূল ধারণায় পৌঁছে যেতে পারবে সহজেই।

২.৭ স্মৃতি ও বিস্মৃতি (Memory and Forgetting)

শিখন সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বার বার অভিজ্ঞতা বা তথ্যের সংরক্ষণে কথা বলা হয়েছে। নতুন তথ্যের জারণ, সংরক্ষিত পুরানো তথ্যের ভিত্তিতে নতুন তথ্যের অর্থবোধ করা এই সব বিষয় শিখনের প্রজ্ঞাবাদী মতবাদগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা দরকার। আবার এ কথাও ঠিক যে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকলেও বা সহজ কথায় কোন কিছু শেখা থাকলেও আমরা সবসময় সেগুলি মনে করতে পারিনা। প্রচলিত কথায় এগুলি আমরা ভুলে যাই। স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনের একটি প্রশ্ন, আমরা কেন ভুলে যাই? এই বিষয়গুলিই স্মৃতি ও বিস্মৃতির আলোচ্য বিষয়।

২.৭.১ স্মৃতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Memory)

অতীতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে বা যা শেখা হয়েছে তার সংরক্ষণ ও প্রয়োজন মত তার পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়াকে বলে স্মৃতি। প্রজ্ঞাবাদীদের মতে সংগৃহীত তথ্যের সুবিন্যস্ত দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণকে বলা হয় স্মৃতি। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, পূর্ববর্তী শিখন প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতাজনিত তথ্য সংরক্ষণ ও কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তার পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা হল স্মৃতি। নিচের উদাহরণগুলি দেখুন।

- আপনাকে একটি বৃত্ত আঁকতে বলা হল। আপনি শিখেছিলেন কোন পদ্ধতিতে বৃত্ত আঁকতে হয়। বৃত্ত আঁকার প্রক্রিয়াটি যেভাবে শিখেছিলেন সেইভাবে পরপর মনে পড়ল। আপনি বৃত্তটি আঁকলেন।
- আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মনোবিজ্ঞানী সামাজিক নির্মিতিবাদের কথা বলেছিলেন তার নাম কী? আপনি আগে নামটি শিখেছেন। কিন্তু এখন নামটি মনে পড়ছে না। আপনি নামটি বলতে পারলেন না।

দুটি ক্ষেত্রেই তথ্যগুলি স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে। একটির বেলায় আপনার সংরক্ষিত তথ্যের পুনরুদ্রেক ঘটেছে। আর একটিতে তা হয় নি। সুতরাং পুনরুদ্রেক ছাড়া স্মৃতির কার্যকারিতা থাকে না।

এইসব সংজ্ঞা ও বিবরণ থেকে আমরা স্মৃতির অন্ততঃ তিনটি পর্যায় দেখতে পাচ্ছি।

গ্রহণ বা শিখন – প্রথমত যে তথ্য স্মৃতিতে ধরে রাখতে হবে তাকে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ করার অর্থ মনোযোগ দিয়ে নতুন তথ্যটিকে দেখতে, শুনতে বা অন্যভাবে প্রত্যক্ষণ করতে হবে।

সংরক্ষণ – স্মৃতির ভান্ডারে সুবিন্যস্তভাবে তথ্যটি ধরে রাখার নাম সংরক্ষণ।

পুনরুদ্রেক (Recall)-এই কথার অর্থ সংরক্ষিত তথ্যটি আবার স্মরণ করা। উপরের উদাহরণ দুটিতে এই তিনটি প্রক্রিয়াই স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে চতুর্থ একটি প্রক্রিয়ার কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এইটি পুনরুদ্রেকের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)-এই কথাটির অর্থ চেনা। যেমন দ্বিতীয় উদাহরণটির বেলায় আপনার মনে হল ব্রুণার। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, না এটা ঠিক নাম নয়। আবার মনে পড়ল বাইগট্স্কি। এবার আপনার মনে হল এটিই ঠিক নাম কারণ এবার আপনি নামটি চিনতে পেরেছেন। এই প্রক্রিয়া ছাড়া পুনরুদ্রেক অসম্পূর্ণ তবে স্মৃতি সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বে এই প্রক্রিয়াকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

স্মৃতির সংরক্ষণ প্রক্রিয়া – আমরা চারপাশে যা কিছু দেখি বা শুনি তার সবকিছুই আমরা মনে রাখি না। একটু বাছাই করে নির্বাচিত বিষয় মনে রাখি মাত্র। প্রাথমিকভাবে এই বাছাই করার কাজটি করে চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি। কতরকম শব্দই তো কানে পৌঁছায়, তার সব কি আমরা শুনি? এর পরবর্তী বাছাই প্রক্রিয়ার নাম মনোযোগ। যে উদ্দীপকর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই সেটি স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।

শিখনের প্রজ্ঞাবাদী মতবাদ সম্বন্ধে বলার সময় উল্লেখ করা হয়েছিল যে আমরা যে তথ্য গ্রহণ করি তা অবিকল একইরকম অবস্থায় সংরক্ষিত করি না, কিছুটা নিজের মত করে পরিবর্তন করে নিই। এই প্রক্রিয়ার নাম **তথ্য জারণ**। তথ্যের জারণ না হলে তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য সংরক্ষণ করার জন্য জারণের উদ্দেশ্যে তথ্যকে খুব অল্প সময় (২০ সেকেন্ডের মত) ধরে রেখে তারপর তাকে স্মৃতির ভান্ডারে স্থান করে দেওয়া হয়। এই স্থায়ী স্মৃতির ভান্ডারকে বলা হয় **দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long Term Memory)**। আর জারণের উদ্দেশ্যে যে স্বল্পকালীন ধারণ তাকে বলে **স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি (Short Term Memory)**। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি থেকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রূপান্তরিত করার জন্য দুই রকমের জারণ ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

- **চর্চামূলক মহলা (Maintenance rehearsal)** – আগত তথ্যটিকে বার বার আবৃত্তি (মনে মনে) করে তাকে সংরক্ষিত করা। যেমন, কারও টেলিফোন নম্বর, একটি ছড়া, কোন কিছুর সংজ্ঞা ইত্যাদি।

- **বিশদীয় মহলা (Elaborative rehearsal)** – চর্চামূলক মহলায় তথ্যটি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বিশদীয় মহলায় তথ্যের সরলীকরণ, বাছাই, শ্রেণিভূক্ত করা, পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গো যুক্ত করা প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে চর্চামূলক মহলার সাহায্যে কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করলে মাঝে মাঝেই তার চর্চা করার প্রয়োজন হয়। না হলে সংরক্ষণ দুর্বল হয়ে যায়। যেমন, মুখস্থ করে পরীক্ষা দিলে কয়েকদিন পরেই আমরা বিষয়টি ভুলে যাই। কিন্তু যে বিষয়টি বিশদীয় মহলার সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা হয়েছে তা আমরা সহজে ভুলি না।

এইভাবে স্মৃতির সংরক্ষণ প্রক্রিয়াতে প্রত্যভিজ্ঞার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেপথ্যে থেকে কাজ করে। মনোবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন **অধিজ্ঞান (Metacognition)**। সহজ কথায় অধিজ্ঞান হল আমি কী জানি বা জানি না (স্মৃতিতে কী সংরক্ষিত আছে বা নেই), কোন তথ্যটি ঠিক কোনটি ভুল এই সব সম্বন্ধে একধরনের বোধ। আমি যা জানিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করলে, স্মৃতিতে খুঁজে দেখার আগেই আমি বলতে পারি আমি জানি না। বাইগটস্কির জায়গায় ব্রুণারের নাম মনে পড়লে বুঝতে পারি নামটা ঠিক হল না। এই বোধই অধিজ্ঞান।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য আমরা সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখি। এরজন্য সচেতনভাবে আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। ঠিক যেভাবে উদ্ভিদ্ বা প্রাণিজগতের শ্রেণিবিভাগ করা হয়, সেই ধরনের পদ্ধতিতেই সমস্ত তথ্য সঞ্চিত থাকে। কিন্তু চর্চামূলক মহলা দ্বারা সংরক্ষিত স্মৃতি এমন সুবিন্যস্ত না হওয়ার জন্য তা স্থায়ী হয় না।

ছোটদের স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য এখানে শিক্ষকদের জেনে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে তাঁরা প্রাথমিক **ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারবেন**।

- ছোটরা একবারে অনেকটা তথ্য জারণ করতে পারে না। আপনি যদি একটানা অনেকটা তথ্য দ্রুত তাদের সামনে তুলে ধরেন তবে তাদের পক্ষে সেটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। ধীরে ধীরে ছোট ছোট অংশ একবারে তুলে ধরতে হবে।
- ছোটরা চর্চামূলক মহলা বেশি করে। বড় হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো চর্চামূলক মহলার স্থান নেয় বিশদীয় মহলা। সেজন্য অনেক কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন। প্রাথমিকের উঁচু ক্লাসগুলিতে ক্রমশ বিশদীয় মহলার সুযোগ বাড়াতে হবে। শিক্ষককেই এ বিষয়ে সাহায্য করতে হবে।
- ছোটদের সুযোগ দিন যাতে তারা নিজেদের মত করে বুঝতে ও বলতে পারে (নির্মিতিবাদ)। তাহলে তারা বিশদীয় মহলা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে। আপনার মত করে বলার জন্য চাপ দেবেন না।

- ছোটদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে পড়ানোর সঙ্গো যুক্ত করে দিন। তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে উৎসাহ দিন। বই সহায়ক উপকরণ মাত্র।
- কিছু কিছু বিষয় তাদের বার বার চর্চার করার সুযোগ দিন। চর্চা বাড়িতে নয়, আপনার তত্ত্বধানে হওয়া দরকার।

ছোটদের মনোযোগ ব্যাঘাতপ্রবণ। এজন্য তাদের সংরক্ষণ বিঘ্নিত হতে পারে। সেজন্য তথ্য উপস্থাপন করায় বৈচিত্র্য আনুন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ৪ (Check Your Progress – 4)

নির্দেশ ঃ ক) আপনার উত্তর নিচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) ব্রুণারের মত অনুযায়ী শিখনের তিনটি স্তর কী কী?

২) ব্রুণারের পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা আয়োজক ও সহায়কের – এই কথাটির অর্থ কী?

৩) বোধহীন শিখন কাকে বলে?

৪) কোন শিক্ষা বিজ্ঞানী অগ্রিম সংগঠকের কথা বলেছেন?

(ক) ব্রুণার
(খ) অসুবেল
(গ) পিঁয়াজে
(ঘ) স্কিনার

৫) বাইগট্স্কির মতে বৌদ্ধিক বিকাশের ভিত্তি দুটি কী কী?

৬) সন্নিহিত বিকাশের সীমা কী?

৭) বাইগট্স্কির মতবাদকে সামাজিক নির্মিতিবাদ বলা হয় কেন?

৮) অধিজ্ঞান কাকে বলে?

৯) একটি টেলিফোন নম্বর স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে হলে কী প্রকার মহলার সাহায্য নেওয়া হয়? কেন?

২.৭.২ বিস্মৃতি (Forgetting)

বিস্মৃতি স্মৃতির উল্টোপিঠ। সাধারণত তিনরকম বিস্মৃতি হতে পারে।

- **সংরক্ষণের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা** – যে তথ্য ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি তা উপযুক্ত সময়ে পুনরুদ্রেক করা সম্ভব হয় না। আমরা বলি ভুলে গেছি। অনেক সময় এই জাতীয় বিস্মৃতি স্থায়ী বিস্মৃতিতে পরিণত হয়। আমরা ছোটবেলায় কত কিছু শিখেছিলাম কিন্তু বড় হয়ে কোনদিনই তা মনে পড়ে না।
- **পুনরুদ্রেকের ব্যর্থতা** – স্মৃতিতে বিশদীয় মহলার সাহায্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হলেও কোন বিশেষ সময়ে নানাকারণে তার পুনরুদ্রেক হয় না। আমাদের বেশিরভাগ বিস্মৃতি এইধরণের। যখন দরকার তখন মনে পড়ল না কিন্তু পরে মনে পড়ল, এমন অভিজ্ঞতা সবারই ঘটে।

- **নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা** – উপযুক্ত তথ্যের সঙ্গে অনেক অবান্তর তথ্য মনে পড়ার জন্য আমরা বিভ্রান্ত হই – কোনটা সঠিক।

উপরের সব ধরণের বিস্মৃতির কারণ এক না হলেও কয়েকটি সাধারণ কারণ ও তার প্রতিকার নিচে দেওয়া হল।

২.৭.৩ বিস্মৃতির কারণ (Causes of Forgetting)

নানা কারণে আমাদের বিস্মৃতি ঘটে। কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হল।

সময়ের জন্য বিস্মৃতি (Time)- যত সময় অতিবাহিত হয় ততই অনেক স্মৃতি দুর্বল হয়ে আসে। সেজন্য সাম্প্রতিক ঘটনা আমরা যত সহজে এবং স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি সুদূর অতীতের ঘটনা সেরকম পারি না। কিন্তু এই কথা সবসময় ঠিক নয়। বহু আগেকার অনেক ঘটনা সারাজীবন মনে থাকে, আবার সাম্প্রতিক বিষয় ভুলে যাই। যেমন, এক সপ্তাহ আগে আমার খাদ্যতালিকায় কী ছিল মনে থাকে না। কিন্তু এক বছর আগে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে কী কী খাওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট মনে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে তথ্যের জারণ প্রক্রিয়া বিশদীয় মহলার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয় তার উপর সময়ের প্রভাব কম। **চর্চামূলক মহলার ক্ষেত্রে স্মৃতি** সময়ের **সজ্ঞা সঙ্গে দুর্বল হয়**।

অন্তরায় (Inhibition)-কোন একটি বিষয় শেখার পরই আর একটি বিষয় শিখলে, পূর্ববর্তী বিষয়টি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একে বলা হয় পশ্চাৎমুখি অন্তরায়। যেমন, একটি কবিতা মুখস্থ করার পর যদি আর একটি কবিতা মুখস্থ করা হয় তবে প্রথম কবিতাটি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার অনেক সময় একটি বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখলে পূর্ববর্তী শিখনের প্রভাবে পরবর্তী বিষয়টি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একে বলা হয় **সম্মুখমুখি অন্তরায়**। যেমন, একটি কবিতা মুখস্থ করার পর ব্যাকরণের সূত্র শেখার চেষ্টা করলে বার বার ভুল হয়ে যায় কিন্তু কবিতাটি মনে থাকে। যদি দুটি বিষয় একইধরণের হয় তবে অন্তরায়জনিত বিস্মৃতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু **নানাধরনের** বিষয়বস্তু শিখলে সে সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

ক্লান্তি (Faligue)-শরীর ক্লান্ত থাকা অবস্থায় শেখা বিষয়ের বিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু মানসিক ক্লান্তির দরুণ বিস্মৃতি ঘটে আরও বেশি। মানসিক ক্লান্তি কথাটির অর্থ, একই কাজ বার বার করা, একঘেয়েমি বোধ, অপছন্দের বিষয় জোর করে শেখা, খুব বেশি ব্যাঘাত ঘটার মত পরিবেশে জোর করে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা এই সবের দরুন যে মানসিক অবস্থা হয় তাই। কিন্তু কাজের বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এগুলি মানসিক ক্লান্তি দূর করে। শিক্ষক যদি ক্লাসে একইভাবে দীর্ঘসময় বক্তৃতা দিয়ে কিছু বোঝানোর বা বর্ণনা করার চেষ্টা করেন তবে সহজেই শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্লান্তি আসে। তারা ভুলে যায়। বিশ্রাম ও বৈচিত্র্য এই দুটি দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করার উপায়।

বোধহীন শিখন (Meaningless learning)- বোধহীন শিখনের অর্থ কোন অসংলগ্ন বিষয়কে অপরিবর্তিত অবস্থায় চর্চামূলক মহলার সাহায্যে সংরক্ষণ করার চেষ্টা। এক্ষেত্রে সহজেই বিস্মৃতি ঘটে। আগেকার দিনে মনোবিজ্ঞানীরা বিষয়বস্তুর দীর্ঘ বিষয় সবটা একসঙ্গে শেখা বা দুই-তিনটি অংশে ভাগ করে নিয়ে পড়ার মধ্যে কোনটি বিস্মৃতি বেশি ঘটায় তাই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। অংশ ভাগ করে শিখলে, একটি অংশের উপর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অংশের অন্তরায়জনিত বাধা সৃষ্টি হতে পারে এবং ভুল হতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টি তথ্যজারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এক দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে। একসঙ্গে অনেকটা বিষয় যদি শিক্ষক তাদের সামনে তুলে ধরেন তবে তাদের পক্ষে সেই তথ্য জারণ করা সম্ভব হয় না, তারা ভুলে যায়।

প্রক্ষোভজনিত বিস্মৃতি - আমরা যখন খুব বেশি উদ্বিগ্ন থাকি, ভীত অবস্থায় অথবা খুব বিচলিত অবস্থায় থাকি তখন কোন কিছু শিখতে গেলে তার সংরক্ষণ হয় না। আবার ঐ অবস্থায় সংরক্ষিত স্মৃতির পুনরুদ্রেকও সম্ভব হয় না। এই কারণে পরীক্ষার সময় অনেক কিছুই মনে পড়ে না। যে ছাত্র বা ছাত্রী আপনাকে ভয় পায়, তারপক্ষে আপনার কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যাতে উদ্বেগহীন হয়ে ক্লাসের পড়ায় অংশ নিতে পারে, সেদিকে নজর দিন।

স্মৃতির নির্মাণ - পুনরুদ্রেক করার সময় কখনও কখনও আমরা এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে ফেলি। তার ফলে যে তথ্য আমরা স্মরণ করি তাকে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করি। স্মৃতির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেকের সময় যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে (অধিজ্ঞান) তার ব্যর্থতার জন্যই এরকম হয়। একে বলে হয় **স্মৃতির নির্মাণ**। একই ধরনের অভিজ্ঞতা মিশে গিয়ে এই ধরনের নির্মিত স্মৃতির সৃষ্টি হয়।

ছাত্রছাত্রীদের বেলাতেও একটি বিষয়ের স্মৃতির সঙ্গে আর একটি বিষয়ের স্মৃতি মিশে মনগড়া ধারণা তৈরি হয়। তারা মনে করে আমি ঠিকই বলেছি বা লিখেছি। স্মৃতির নির্মাণজনিত সমস্যা রোধ করা যায়। শিক্ষকরা কোন কিছু শেখানোর সময় দুটি বিষয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বা স্থূল পার্থক্যগুলি আছে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সেগুলি চিহ্নিত করতে পারে সেদিকে যত্নবান হলে, এক স্মৃতির সঙ্গে অপর স্মৃতির এই বিভ্রান্তি কম হবে। একে বলা হয় **বিনিশ্চয়** (Discrimination)।

মিথ্যা স্মৃতি - স্মৃতির নির্মাণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত আর একটি প্রসঙ্গ হল মিথ্যা স্মৃতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের কল্পনার জগৎকে মিশিয়ে ফেলে। প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এরকম ঘটতে পারে। শিক্ষকদের উচিত এই বিষয়টি ধৈর্য্য ধরে ধীরে ধীরে মেটানো। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্যা দূর হয়। কাজেই শাস্তি বা রূঢ় ব্যবহার করে শিশুদের স্বপ্নের জগৎটাকে ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয়।

স্মৃতি বা বিস্মৃতি প্রসঙ্গে শিক্ষকদের করণীয় -

যে সব বিষয় বারবার আবৃত্তি করে শিখতে হয় (চর্চামূলক মহলা) সেই বিষয়গুলি যাতে মাঝে মাঝেই চর্চা করা হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। নানাভাবে সেগুলি কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

- পূর্ব অভিজ্ঞতা যা ক্লাসের পড়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে অথবা যা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনে তারা লাভ করেছে তাকে সবসময়ই নতুন কিছু শেখানোর সঙ্গো যুক্ত করতে হবে।
- ছাত্রছাত্রীরা যে সব কাজ ভালোবাসে (যেমন, খেলাধূলা) সে সব কাজের সঙ্গো শেখার বিষয় যুক্ত করলে তথ্যের জারণ দীর্ঘ সংরক্ষণের সহায়ক হবে। যথা, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এগুলি সরাসরি খেলার মাঠ, কোর্ট ইত্যাদি পরিমাপের সঙ্গো যুক্ত করা যায়।
- প্রতিটি শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিনিশ্চয় ও সংগঠন এর ফলে দৃঢ় হবে।
- শিখনের বিষয়বস্তু ও তার শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা দরকার।
- অন্তরায়জনিত বাধা দূর করার জন্য দুটি একই ধরণের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ভিন্ন কাজ রাখলে তা সহায়ক হবে। যেমন, ইতিহাস পড়া ও ভূগোল পড়ার মাঝখানে কিছুক্ষণ আঁকা বা অন্যকোন হাতের কাজ রাখা যেতে পারে।
- ছাত্রছাত্রীদের স্কুল, শিক্ষক, পাঠ্যবিষয় এগুলির সম্বন্ধে উদ্বেগ বা ভীতির সঞ্চার না হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
- ছাত্রছাত্রীরা কেউই আগ্রহ নিয়ে স্কুলে আসে না। আগ্রহ সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষকের। আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেজন্য মনোযোগ আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নয় তা ধরে রাখার শর্ত হল আকর্ষণীয় শিক্ষণ পদ্ধতি। **মনোযোগ** কম হলে বিস্মৃতি বেশি হবে।
- ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীদের বিশদীয় মহলায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

২.৮ সার সংক্ষেপ (Let us Sumup)

শিখন কথাটির অর্থ আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। প্রকাশ্য আচরণ বাইরে থেকে দেখা যায় বোঝা যায়। অপ্রকাশ্য আচরণ মূলত মানসিক ক্রিয়া যা সরাসরি বোঝা যায় না কিন্তু যা প্রকাশ্য আচরণের পিছনে কাজ করে। শিখনের ফলে আচরণ উন্নততর হয় এবং তা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন।

শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেজন্য মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এইসব ব্যাখ্যা প্রধানভাবে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনকে বুঝতে চেয়েছে। তার প্রথমটিকে বলা হয় আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ কারণ এদের মতে শিখন শুধুমাত্র প্রকাশ্য আচরণের পরিবর্তন।

রাশিয়ান শরীর বিজ্ঞানী পাভলভ কুকুরের লালা নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে তিনি দেখেছেন বারবার খাদ্য দেওয়ার আগে ঘন্টাধ্বনি করলেই লালা নিঃসরণ হয়, এই প্রক্রিয়াকে তিনি নাম দেন অনুবর্তন। ঘন্টাধ্বনি অনুবর্তিত উদ্দীপক ও লালা নিঃসরণ অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয় তখনই

যখন মাঝখানে কোন স্বাভাবিক উদ্দীপক (খাদ্য) ব্যবহার করা হয়। অনুবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুদের অভ্যাসমূলক শিখন হয়। কিন্তু এতে শিক্ষার্থীর কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না।

পরবর্তীকালে স্কিনার দেখিয়েছেন **শিখনের** অর্থ নতুন আচরণ আয়ত্ত করা। শিখননির্ভর করে উদ্দীপকের প্রতি প্রাণির প্রতিক্রিয়া ও তার ফলাফলের উপর। যে প্রতিক্রিয়ার ফল প্রাণির কাছে সন্তোষজনক হয়, সে আচরণটি সে বারবার করতে প্রবৃত্ত হয় এবং সেটি স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়। স্কিনার একে বলেছেন প্রবলন। আর যা তাকে আচরণটি বারবার করতে প্রবৃত্ত করেছে তাকে বল হয় প্রবলক। প্রবলন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই প্রকার হয়।

শিখনের অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক আচরণের পরিবর্তন বা সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন প্রকাশ্য আচরণের পরিবর্তন মানসিক সংগঠনের পরিবর্তনেরই ফল। এই বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা করেন জার্মানীর তিনজন মনোবিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে একজন কোয়েলার নামক মনোবিজ্ঞানী। কোয়েলার দেখেছেন বাইরের জগতে যে সব উদ্দীপক আছে আমরা প্রায়ই তাদের মধ্যে একটা সংগঠন বা নক্সা লক্ষ করি। এই নক্সা দেখার শর্ত হল, কিছু বস্তু কাছাকাছি থাকলে, একইরকম হলে অথবা নক্সাটি পরিচিত হলে, তারা একত্রে একটি নক্সা হিসাবে সংগঠিত হয়।

কোয়েলারের মতে শিখন কথার অর্থ একটি পরিস্থিতির উপাদানগুলির মধ্য যে অন্তর্নিহিত নক্সা বা ছক আছে সেটি প্রত্যক্ষ করা। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় তার নাম অন্তর্দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি একটি আকস্মিক আবিস্কারের প্রক্রিয়া।

অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের উন্নততর রূপ শিখনের প্রজ্ঞবাদী দৃষ্টিকোণ। এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে যে সংগঠিত আকারে সঞ্চিত থাকে তার নাম স্কিমা। স্কিমা প্রকৃতিপক্ষে কিছু একই বিষয়ক সংরক্ষিত তথ্যের সমাহার বা সংগঠন। এখানে তথ্য কথাটির অর্থ যে কোন উদ্দীপক যা আমরা মনোযোগ সহকারে দেখি বা শুনি। সংরক্ষিত তথ্যগুলি অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয় না, তাকে নিজের মত করে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম তথ্যের জারণ।

প্রজ্ঞাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমে পিঁয়াজে চারটি স্তরে কীভাবে শিখন সম্পন্ন হয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই চারটি স্তর হল সংবেদন সঞ্চালন স্তর, প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর, মূর্ত সক্রিয়তার স্তর এবং যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর। ব্রুণার মনে করেন ধারণা তৈরি হয় আবিস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শিশুরা প্রথম পর্যায়ে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, পরবর্তী পর্যায়ে ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রতীকের মাধ্যমে শেখে। এই তিন ধরনের অভিজ্ঞতাই ধারণা গঠনের সহায়ক।

অসুবেল মনে করেন শিখন অর্থবহ হলে তবে তা স্থায়ী হয়। তিনি তিনরকম শিখনের কথা বলেছেন। গ্রহণ জনিত শিখন, বোধহীন শিখন এবং অর্থবহ শিখন এই তিনটির মধ্যে তৃতীয় প্রকার শিখন তখনই হয় যখন

আমরা নতুন তথ্যকে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তার অর্থবোধ করি এবং তার সংরক্ষণ করি। তিনি মনে করেন প্রথমে একটি অগ্রিম সংগঠকের উপস্থাপনা প্রয়োজন।

শিখনের প্রজ্ঞাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা প্রজ্ঞার নির্মিতিবাদ। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের মত করে জ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলে। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান তার নিজস্ব এবং কিছুটা স্বতন্ত্র। যদিও মূল উপাদানগুলি সবার ক্ষেত্রে একই। বাইগট্স্কি নামক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন নির্মিতির ক্ষেত্রে সামাজিক ও কৃষ্টিগত পটভূমির গুরুত্ব সর্বাধিক। সেজন্য তার মতকে বলা হয় সামজিক নির্মিতিবাদ।

পূর্ব অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করা ও প্রয়োজনমত তার পুনরুদ্রেক করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্মৃতি। যেসব উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে এসে পৌঁছায় তার সবকিছু গ্রহণ করা হয় না। সেজন্য স্মৃতির প্রথম স্তরটি হল গ্রহণ। গৃহীত তথ্য বিশেষভাবে পরিমার্জিত হয় স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে। সেখান থেকে চর্চামূলক মহলা ও বিশদীয় মহলার সাহায্যে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। বিস্মৃতির অনেক কারন আছে এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান, অন্তরায়, ক্লান্তি ও প্রক্ষোভ ইত্যাদি প্রধান। সবসময়ই চর্চামূলক মহলা বিশদীয় মহলা অপেক্ষা বিস্মৃতি ঘটায় বেশি।

২.৯ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১) নিচের প্রশ্নগুলির দুই-এক কথায় উত্তর দিন। (অনধিক ৬০টি শব্দে)

(ক) প্রকাশ্য আচরণ কাকে বলে?

(খ) **আচরণবাদীদের** মতে শিখনের অর্থ কী?

(গ) মানসিক আচরণের একটি উদাহরণ দিন।

(ঘ) অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কী?

(ঙ) অনুবর্তনের মাধ্যমে শিখনের একটি উদাহরণ দিন।

(চ) সক্রিয় অনুবর্তনের প্রবক্তা কে?

(ছ) প্রবলন ও প্রবলকের মধ্যে পার্থক্য কী?

(জ) আচরণের পরিবর্তন কাকে বলে?

ঝ) প্রবলন কয় প্রকার ও কী কী?

(ঞ) প্রবলন তত্ত্ব অনুযায়ী শিখন কাকে বলে?

(ট) অবাঞ্ছিত আচরণ কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?

(ঠ) অন্তর্দৃষ্টি কী?

(ড) প্রত্যক্ষণের সংগঠনের শর্তগুলি কী কী?

(ঢ) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের একটি নীতি বলুন।

(ণ) পিয়াজেঁর মতে স্কিমা কী?

(ত) পিয়াজেঁর মত অনুযায়ী বৌদ্ধিক বিকাশের স্তরগুলির নাম লিখুন।

(থ) ধারণা গঠন কী?

(দ) অর্থবহ শিখন কাকে বলে?

(ধ) অগ্রিম সংগঠক কাকে বলে?

(ন) সন্নিহিত বিকাশের সীমা কাকে বলে?

(প) বিশদীয় মহলা কাকে বলে?

(ফ) ক্লান্তিভিত্তিক বিস্মৃতির দুইটি উদাহরণ দিন।

(ব) অন্তরায় কয় প্রকার ও কী কী?

(ভ) উদ্বেগের সঙ্গে বিস্মৃতির সম্পর্ক কী?

(ম) অধিজ্ঞান কাকে বলে?

২) নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (অনধিক ১৫০টি শব্দে)

(ক) পাভলভের পরীক্ষাটি বর্ণনা করুন এবং পাভলভের সিদ্ধান্তগুলি লিখুন।

(খ) প্রাচীন অনুবর্তনের সাহায্যে কীভাবে শিখন হয় ব্যাখ্যা করুন।

(গ) প্রবলন কাকে বলে? প্রবলন কীভাবে আচরণ পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করা হয়?

(ঘ) স্কিনারের পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে কীভাবে প্রয়োগ করবেন উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঙ) ব্রুণারের শিক্ষণ পদ্ধতির ধাপগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(চ) অসুবেলের মতানুযায়ী অর্থবহ শিখন কীভাবে হয় ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) বাইগট্স্কির সামাজিক নির্মিতিবাদে শিখনের ক্ষেত্রে সমাজ ও কৃষ্টির ভূমিকা উল্লেখ করুন।

(জ) স্মৃতির আধুনিক মতটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(ঝ) অন্তরায়জনিত বিস্মৃতি কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঞ) তথ্যজারণের সঙ্গে বিস্মৃতির সম্পর্ক কী?

৩) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (অনধিক ২৫০টি শব্দে)

(ক) পাভলভের শিখন বিষয়ক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন। পঠনপাঠনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ পদ্ধতি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) স্কিনারের মত অনুযায়ী কীভাবে বাঞ্ছিত আচরণ আয়ত্ত করা যায় এবং অবাঞ্ছিত আচরণ দূর করা যায় তা উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের শর্ত ও প্রক্রিয়াটি সবিস্তারে আলোচনা করুন।

(ঘ) ব্রুণারের তত্ত্বে ধারণা গঠন কাকে বলে? তাঁর শিখন তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঙ) স্কিমা কাকে বলে? পিঁয়াজের তত্ত্বে যে চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে সেগুলির বিবরণ দিন। শিখনের ক্ষেত্রে পিয়াজেঁর তত্ত্বের গুরুত্ব কী?

(চ) অসুবেলের সঙ্গে ব্রুণারের শিখন পদ্ধতির তুলনামূলক আলেচনা করুন।

(ছ) বাইগট্স্কির সামাজিক নির্মিতিবাদ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন।

(জ) স্মৃতির প্রক্রিয়াটি ব্যাখা করুন এবং বিস্মৃতির কারণগুলি আলোচনা করুন। প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিস্মৃতি কমানোর জন্য শিক্ষকের করণীয় কী?

২.১০ উত্তর সংকেত (Hints to Answer)

অগ্রগতি যাচাই – ১

১) শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যা প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় (১.৩ অংশ)।

২) বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ঘটানোই মূল নীতি। অর্থাৎ বিশেষ উদ্দীপকটির মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর ক্ষমতা সঞ্চয় করা (১.৪.১ অংশ)।

অগ্রগতি যাচাই – ২

১) কোন প্রতিক্রিয়া করার পর তার ফল অনুযায়ী যদি ঐ প্রতিক্রিয়াটি বার বার করার প্রবণতা দেখা যায় তবে ঐ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় প্রবলন। (১.৪.২ অংশ)

২) ইতিবাচক প্রবলন কোন আচরণকে বার বার করতে **উদ্বুদ্ধ** করে। এর ফলে নতুন আচরণ আয়ত্ত করা হয় অর্থাৎ শিখন হয়। নেতিবাচক প্রবলন আচরণটির বিলোপ ঘটায় কারণ প্রাণী ঐ আচরণটি করতে বিরত থাকে (১.৪.২ অংশ)।

৩) উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রবলন।

৪) সমগ্ররূপটি প্রত্যক্ষণ করে সমস্যা সমাধান করার মানসিক প্রক্রিয়ার নাম শিখন। সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষণ করার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি (১.৪.৩ অংশ)

৫) সমগ্রতাবোধের তিনটি শর্ত আছে।

(ক) পরিচিতি (খ) সাদৃশ্য এবং (গ) নৈকট্য (১.৪.৩ অংশ)

৬) যথাসম্ভব বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রূপটি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা এবং ঐ সামগ্রিক রূপটি আবিস্কার করতে সাহায্য করা।

অগ্রগতি যাচাই – ৩

১) অনেকগুলি সম্পর্কিত তথ্য যা একটি সাধারণ নাম দিয়ে প্রকাশ করা যায় তাকে বলে স্কিমা (১.৫.১ অংশ)।

২) (ক) সংবেদন-সঞ্চালক স্তর (খ) প্রাক্‌সক্রিয়তার স্তর (গ) মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (ঘ) যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (১.৫.১ অংশ)

৩) কোন তথ্যকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করার জন্য যেভাবে পরিবর্তন করে নেওয়া হয় তাকে বলে তথ্যের জারণ (১.৫.১ অংশ)।

৪) মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (১.৫.১ অংশ)।

৫) এই স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রাধান্য থাকে।

অগ্রগতি যাচাই – ৪

১) (ক) ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শেখার স্তর (খ) সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখার স্তর (গ) প্রতীকের মাধ্যমে ধারণা গঠন (১.৫.২ অংশ)।

২) শিক্ষক সরাসরি তথ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শেখান না। তিনি কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তাই শেখান। সেজন্য তার ভূমিকা সহায়ক ও আয়োজকের (১.৫.২ অংশ)।

৩) কোন তথ্যকে অপরিবর্তিত অবস্থায় স্মৃতিতে অবিকল সংরক্ষণ করার নাম বোধহীন শিখন (১.৫.৩ অংশ)।

৪) (ক) অসুবেল।

৫) (ক) জৈবিক ভিত্তি (খ) সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ভিত্তি (১.৬.১ অংশ)।

৬) একজন শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর বা মান সর্বোচ্চ কতটা উন্নত করা যায় তাকে বলা হয় সন্নিহিত বিকাশের সীমা (১.৬.১ অংশ)।

৭) তার কারণ তিনি মনে করেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজস্ব প্রজ্ঞার সংগঠন গড়ে তোলে (১.৬.১ অংশ)।

৮) অধিজ্ঞান একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা আমাদের সঠিক বিষয়টি স্মরণ করতে সাহায্য করে বা অনেকগুলি একইধরনের সংরক্ষিত তথ্য থেকে সঠিক তথ্যটি বেছে নিতে সাহায্য করে (২.৭.১ অংশ)।

৯) চর্চামূলক মহলা। কারণ টেলিফোন নম্বরটি অবিকল একই ক্রমানুসারে মনে রাখতে হবে। কোন পরিবর্তনের সুযোগ নেই (১.৭.১ অংশ)।

পাঠ একক - ৩

সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন ও শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন
(Activity Based Learning and Learning Process Enhancement Skills)

গঠন **(Structure)**

৩.১ সূচনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ শিক্ষণের দক্ষতার প্রকৃতি

৩.৪ শিক্ষণ দক্ষতার প্রকারভেদ

- **৩.৪.১** প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা
- **৩.৪.২** অনুভবমূলক দক্ষতা
- **৩.৪.৩** সঞ্চালনমূলক দক্ষতা
- **৩.৪.৪** প্রত্যক্ষণ ও মনোযোগদানের দক্ষতা
- **৩.৪.৫** সামাজিক দক্ষতা
- **৩.৪.৬** ভাববিনিময়ের দক্ষতা

৩.৫ শিক্ষণের দক্ষতার শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ

- **৩.৫.১** পাঠ শুরু করার দক্ষতা
- **৩.৫.২** পাঠ চলাকালীন বক্তৃতা বা ব্যাখ্য দেওয়ার দক্ষতা
- **৩.৫.৩** প্রবলন তথা প্রতিসংকেত প্রয়োগের দক্ষতা
- **৩.৫.৪** সারসংক্ষেপ করার দক্ষতা
- **৩.৫.৫** প্রশ্ন করার দক্ষতা
- **৩.৫.৬** উদাহরণ দেওয়ার দক্ষতা
- **৩.৫.৭** সহায়ক উপকরণ তথা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ উত্তর সংকেত

৩.১ সূচনা (Introduction)

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এককে শিখনের তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখনের সঙ্গে শিক্ষণের সম্পর্ক প্রসঙ্গে শিক্ষণের শিশুকেন্দ্রিকতা এবং শিক্ষার্থীদের দিক থেকে শিখনের পদ্ধতি ও প্রকরণগুলি সম্বন্ধে আপনারা জেনেছেন। এবার ঐ বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সমস্ত কিছু জানার পরও আপনার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে একদল ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসের মধ্যে শিক্ষাদান করার সময় তাদের শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষণের সামঞ্জস্য কীভাবে করবেন, কোন কোন পদ্ধতির উপর কোন সময় গুরূত্ব দেবেন এবং সর্বোপরি তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রথমেই আপনার জানা দরকার শিক্ষণের জন্য একজন শিক্ষকের কোন কোন দক্ষতার প্রয়োজন এবং সেইসব দক্ষতার চর্চা করার মধ্যে দিয়ে তাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াটি কী। সেইজন্য বর্তমান এককটিতে শিক্ষণের দক্ষতার বিষয়ে ধারণা দেওয়া হল।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে আপনি –

- শিক্ষণের দক্ষতাগুলির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতার ও তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে কীভাবে দক্ষতাগুলিকে প্রয়োগ করবেন তা বলতে পারবেন ও উপযুক্ত সময়ে প্রদর্শন করতে পারবেন।

৩.৩ শিক্ষণের দক্ষতার প্রকৃতি (Nature of Teaching Skills)

প্রথমেই যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া দরকার সেটি হল, দক্ষতা কী এবং শিক্ষণের দক্ষতাই বা কী? সাধারণভাবে দক্ষতার অর্থ, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন বা অভ্যাসের সাহায্যে কোন বিশেষ কার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতা বা পটুত্ব অর্জন। বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে দক্ষতা কথাটিকে প্রায় একইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, শরীরের বিশেষ বিশেষ পেশিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করে কোন কার্য সম্পাদন করার পটুত্বকে দক্ষতা বলা হয়, যেমন, হাঁটা, দৌড়ানো, লেখা, হাত দিয়ে কোন কাজ করা ইত্যাদি সবই দক্ষতা।

দক্ষতার উপরোক্ত ধারণা থেকে দক্ষতার প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা যাবে। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি।

- দক্ষতা কোন কাজ করার জন্য অর্জিত পটুত্ব। অর্থাৎ দক্ষতা কোনও না কোন ক্রিয়া সম্পাদনের উদ্দেশ্য বিকাশলাভ করে।

- দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার হয়। বিশেষ বিশেষ ধরণের দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় দেখা যাবে প্রশিক্ষণের ধরণ স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রশিক্ষণের কিছু না কিছু ভূমিকা আছে।
- দক্ষতার জন্য দরকার দক্ষতা অর্জনকারীর সক্রিয়তা। অর্থাৎ অনুশীলন, চর্চা, অভ্যাস এইগুলি ছাড়া দক্ষতা অর্জন করা যায় না।
- দক্ষতার জন্য পরিণমন দরকার হয়। অর্থাৎ সমস্ত বয়সে সমস্ত রকম দক্ষতা অর্জন করা যায় না। দুই বছরের শিশু লেখা শিখতে পারবে না। তিন বছরের শিশু ভালোভাবে কথা বলতে পার**লেও** বড় বড় বাক্য বাবহার করে বিস্তারিতভাবে তার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে না।
- যে কোন দক্ষতার জন্যই প্রয়োজন হয় তার জন্য নির্ধারিত উপাদান ও হাতিয়ারগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। যেমন, পড়া একটি দক্ষতা। তার জন্য, দৃষ্টি, চোখের সঞ্চালন, কণ্ঠস্বরের জন্য প্রয়োজনীয় বাক্‌যন্ত্র, জিহ্বা, ঠোঁট সবকিছুর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার।

এখন প্রশ্ন হল শিক্ষণের দক্ষতা কী এবং তার প্রকৃতিই বা কী? শিক্ষণ কোন একটি মাত্র দক্ষতা নয়। অনেকগুলি দক্ষতার সমন্বয় করে, শিক্ষণ সম্পন্ন করতে হয়। সেজন্য শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত রকম দক্ষতার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের দরকার হয়। সেজন্য শিক্ষণের দক্ষতাকে এক কথায় সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায়,

শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করা এবং তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে তার অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষক যে সমস্ত দক্ষতার সুষ্ঠু সমন্বয় করেন তাকেই বলা হয় শিক্ষণের দক্ষতা।

এই আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই শিক্ষণ দক্ষতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছেন।

- শিক্ষণের দক্ষতা জটিল কারণ তা একটিমাত্র দক্ষতা নয়, বহু দক্ষতার সমন্বয়।
- এইসব দক্ষতাগুলির জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ কিন্তু সেগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য দরকার তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার।
- শিক্ষণের দক্ষতার চরম উদ্দেশ্য শিক্ষার লক্ষ্যগুলি অর্জন করা।
- শিক্ষণের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শিখন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে।
- শিক্ষণের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে বাঞ্ছনীয় পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- শিক্ষনের দক্ষতা ও শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাঞ্জস্য থাকা দরকার।

শিক্ষণ দক্ষতার এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পারি এই দক্ষতার প্রকারভেদগুলি কী কী।

৩.৪ শিক্ষণ দক্ষতার প্রকারভেদ (Types of Teaching Skills)

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষণ দক্ষতা একাধিক দক্ষতার সমন্বয়। শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম দক্ষতার তালিকা ও তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বল্প সময় ও পরিসরের মধ্যে বলা কঠিন। সেজন্য প্রধান প্রকারভেদগুলি তুলে ধরা হল।

৩.৪.১ প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা (Cognitive Skills)

সহজ কথায় প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা হল সেইসব মানসিক দক্ষতা যার সাহায্যে একজন শিক্ষক জ্ঞান আহরণ করা, তার সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনমত তার উপযুক্ত প্রয়োগ করার কৌশল সম্বন্ধে পটুত্ব অর্জন করতে পারেন। শিক্ষক নিজে একজন অনুসন্ধানী চিরশিক্ষার্থী না হলে, তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শিখনে উদ্দীপিত করতে পারবেন না। সমস্ত রকম বৌদ্ধিক, যৌক্তিক, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা প্রজ্ঞামূলক দক্ষতার অন্তর্গত।

৩.৪.২ অনুভবমূলক দক্ষতা (Affective Skills)

শিখন ও শিক্ষণের সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে আনন্দ, উদ্বেগ, শিক্ষকের সঙ্গো ইতিবাচক সম্পর্ক, বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় যা সরাসরি শিখন ও শিক্ষণের সঙ্গো জড়িত। এই কারণে শিক্ষকের পক্ষে তার শিক্ষার্থীর আনন্দ, উদ্বেগ, সাফল্যের জন্য সন্তোষ, ব্যর্থতায় ভয়, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুরাগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার দক্ষতা থাকা একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন অন্যের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করা এবং সেইসঙ্গো নিজের প্রক্ষোভ (Emotion) নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা। একদিকে শিক্ষক নিজের ক্রোধ, বিরাগ, আনন্দ ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন, অন্যদিকে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতাও অর্জন করবেন, এইগুলিই অনুভবমূলক দক্ষতা।

৩.৪.৩ সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (Psychomotor Skill)

শরীরের পেশীগুলির সমন্বয় করে ক্রিয়া সম্পাদন করার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই ধরণের দক্ষতার সঙ্গো যেহেতু পেশি সঞ্চালনের বিষয়টি যুক্ত, সেহেতু এই ধরণের দক্ষতাকে সঞ্চালনমূলক দক্ষতা বলা হয়। একজন শিক্ষকের দরকার হয় বোর্ডে লেখা ও ছবিআঁকা। নিজের মুখভঙ্গী নিয়ন্ত্রণ করা, নিজের অবস্থান, চলাফেরা দেহভঙ্গিমা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। শরীরের ভাষা (Body Language) শ্রেণিকক্ষে বা তার বাইরে শিক্ষণের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। শিক্ষক খুশি হলে বা বিরক্ত হলে মুখভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তার হাতের লেখা ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ, তিনি যখন কোন কাজ করে দেখান বা ছবি আঁকেন তখন ছাত্রছাত্রীরা তা অনুকরণ করে শেখে, তাঁর বসার ভঙ্গী, চলাফেরা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নিজের উৎসাহ উদ্দীপনা ক্লান্তি এমনকি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতি তার আগ্রহের কথা ফুটে ওঠে। সুতরাং সঞ্চালন মূলক দক্ষতা সম্বন্ধে জানা ও তার ব্যবহার করা শিক্ষকের পক্ষে আবশ্যিক।

৩.৪.৪ প্রত্যক্ষণ ও মনোযোগদানের দক্ষতা (Perceptual Skill and Skill of Attention)

এইগুলি প্রজ্ঞামূলক দক্ষতার অন্তর্গত হলেও বিশেষভাবে বলা দরকার এই জন্য যে একজন শিক্ষকের নিজস্ব দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও এইগুলি প্রাথমিক শর্ত। স্থানিক বিস্তারের প্রত্যক্ষণ (Spatial perception) আমাদের

বিমূর্ত চিন্তার প্রাথমিক ভিত্তি। সেজন্য শিক্ষকের পক্ষে নিজে একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক হয়ে ওঠা খুবই জরুরি। আর সেইসঙ্গে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা, **মনোযোগ** ধরে রাখা, মনোযোগের ব্যাঘাত অগ্রাহ্য করার দক্ষতা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

৩.৪.৫ সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)

সামাজিক দক্ষতার মূল কথা আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং সেইজন্য সমাজগ্রাহ্য পন্থায় পারস্পরিক ভাব বিনিময়, আদান প্রদান, ইত্যাদি। সামাজিক দক্ষতা মানুষের জন্মসহজাত নয়, কিন্তু **যৌথবদ্ধতা** অনেকটা সহজাত। সেজন্য প্রতিটি সমাজের আচরণ বিধি ঐ সমাজের সব মানুষকেই শিখতে হয়। বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ সমাজেরই প্রতিভূ। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষকের সঙ্গে তাদের সামাজিক সম্পর্ক শিখনকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের উপযোগী সামাজিক দক্ষতাগুলি অর্জন করতে হয়। দলবদ্ধ শিখনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিশেষ প্রয়োজন। যে শিক্ষক সামাজিক ক্ষেত্রে অপটু তার পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বহু শিক্ষাবিদ্ই শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সরাসরি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৪.৬ ভাববিনিময়ের দক্ষতা (Communication Skill)

এইজাতীয় দক্ষতা শিক্ষণের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক ও অন্যান্য দক্ষতার মধ্যে মিলেমিশে আছে ভাব বিনিময়ের দক্ষতা। শিক্ষণ একটি ভাব বিনিময়ের প্রক্রিয়া শিক্ষক যা বলতে চান, যা বোঝাতে চান, তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে সঠিকভাবে বোধগম্য হচ্ছে কী না সেটা নির্ভর করে, শিক্ষক কতটা দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন এবং তিনি যে অর্থে কিছু বলছেন, ছাত্রছাত্রী ঠিক সেই অর্থেই বক্তব্য অনুভব করতে পারার উপর। এর জন্য শিক্ষককে বাচনিক দক্ষতা (Verbal skill) ও অবাচনিক দক্ষতা (Nonverbal skill) সমানভাবে অর্জন করতে হয়। বাচনিক দক্ষতা নির্ভর করে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার উপর আর অবাচনিক দক্ষতা ছড়িয়ে আছে শিক্ষকের অসংখ্য ক্রিয়া কলাপের মধ্যে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ১ (Check Your Progress – 1)

১) শিক্ষণের দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?

___

___

___

২) প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা কী?

___

___

৩) সঞ্চালনমূলক দক্ষতার দুটি উদাহরণ দিন।

___

___

৪) বাচনিক ও অবাচনিক দক্ষতার পার্থক্য কী?

___

___

৩.৫ শিক্ষণের দক্ষতার শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ (Application of Teaching Skills in Class room)

প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের **মাধ্যমে** শিক্ষণের দক্ষতাগুলি শেখাই যথেষ্ট নয়। সেগুলি আত্মস্থ ও স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত না করতে পারলে প্রকৃত শ্রেণিকক্ষে সফলভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ শিক্ষণ কোন যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করার প্রক্রিয়া নয়, একটি সজীব সচল আদান প্রদানের প্রক্রিয়া। এইজন্য শিক্ষাবিদ্‌রা শ্রেণিকক্ষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ২৬ টি দক্ষতাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিটি দক্ষতাকে অভ্যাস করার জন্য যে পদ্ধতির কথা তাঁরা বলেন তার নাম অনুশিক্ষণ (Microteaching)। অনুশিক্ষণ কোন শিক্ষণ পদ্ধতি নয় বরং দলগত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। অনুশিক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্ত রকম দক্ষতার বিবরণ দেওয়া বর্তমান পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু উদাহরণসহ কয়েকটি আবশ্যকীয় দক্ষতার প্রয়োগ পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে আমরা শিক্ষক যতক্ষণ উপস্থিত থাকেন সেই সময়ের মধ্যে মূল পঠন পাঠনের জন্য তিনি **শ্রেণিকক্ষে যা যা করেন সেইগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। যেমন,**

- পাঠ শুরু করার দক্ষতা।
- পাঠ চলাকালীন বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা দেওয়ার দক্ষতা।
- প্রবলন তথা প্রতিসংকেত প্রয়োগের দক্ষতা।
- সার সংক্ষেপ করার দক্ষতা।
- প্রশ্ন করার দক্ষতা।
- উদাহরণ দেওয়ার দক্ষতা।
- সহায়ক উপকরণ তথা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা।

৩.৫.১ পাঠ শুরু করার দক্ষতা (Skill of Introducing Lesson)

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষক কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে পাঠ শুরু করবেন, তার উপর সারা ক্লাসের গতিপ্রকৃতি ও পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের মান নির্ভর করে। এইজন্য শিক্ষক কী কী করবেন তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

- আকস্মিক, চমকপ্রদ অথবা আকর্ষনীয় কিছু বলে বা দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন এবং কৌতুহল জাগিয়ে তুলুন।
- তারা কতটা এবং কী কী জানে সেটা যাচাই করে নিন। জানার বিষয়টি শুধুমাত্র পূর্বদিনের পাঠে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্য সম্বন্ধেও যাচাই করা যেতে পারে।
- আজকের পাঠের কেন্দ্রিয় ধারণা ও ক্লাসের কার্যক্রম সম্বন্ধে অগ্রিম একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।
- ছাত্রছাত্রীদের কৌতুহল সজাগ রাখুন। না হলে পরবর্তী সময়ের জন্য কোন ঔৎসুক্য থাকবে না।
- এই পর্যায়ের জন্য যেসব সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে সেগুলির যথাযথ ব্যবহার করুন।

মনে রাখতে হবে এই পর্যায়ে ৪ থেকে ৫ মিনিটের বেশি সময় পাওয়া যাবে না। এরপর ঘোষিত সূচি অনুযায়ী পাঠ পরিচালিত হবে। কার্যসূচি ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় স্থির করা যেতে পারে।

৩.৫.২ পাঠ চলাকালীন বক্তৃতাএবং ব্যাখ্যা দেওয়ার দক্ষতা (Skill of Lecturing and Explaining)

একে অনেকে সহজভাবে বলেন বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা (Skill of lecturing)। ক্লাসে শিক্ষককে অনেক সময় কথা বলতে হয়। বর্ণনা দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, ঘটনার বিবরণ দেওয়া, বা এরকম আরও অনেক কারণে শিক্ষককে যে কথা বলতে হয় তাকেই বলা হয়েছে বক্তৃতা।

- প্রথমেই আপনার বক্তৃতা বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য, ঘোষিত সূচি ও সময়সীমার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কী না সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।
- এখানে আপনার বাচনিক দক্ষতাকে কাজে লাগান। আপনার বক্তব্যের ভাষা ছাত্রছাত্রীদের বয়স, শিক্ষার মান, সামাজিক পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর উপযোগী হচ্ছে কী না লক্ষ্য **রাখুন।**

- বক্তব্য বিষয় একটানা দীর্ঘ সময় ধরে বলা উচিত নয়। ছোট ছোট বিরতি দিন, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করুন এবং মাঝে মাঝে সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করুন।
- প্রশ্ন করে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে সুযোগ দিন।
- বক্তৃতা সরস ও কৌতুকপূর্ণ হলে আকর্ষনীয় হয়।
- স্বরের উত্থানপতন, উচ্চারণের স্পষ্টতা বজায় রেখে মাঝামাঝি দ্রুততার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলা দরকার যেন শেষ সারির ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্ট শুনতে পায়।
- প্রতিটি বক্তৃতাংশের পর ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন করে তার সারাংশ আবার বলুন। এর ফলে আপনার বক্তৃতার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আপনিও ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে প্রতিসংকেত (Feedback) পাবেন।

৩.৫.৩ প্রবলন তথা প্রতিসংকেত প্রয়োগের দক্ষতা (Skill of using Reinforcement & Feedback)

স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন পড়ার সময় আপনারা দেখেছেন যে কোন আচরণের পর ইতিবাচক প্রবলক প্রয়োগ **করলে**সেটি স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়, নেতিবাচক প্রবলকের প্রভাবে আচরণটি লোপ পায়। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে কোন অবাঞ্ছিত আচরণ করলে শিক্ষক নেতিবাচক প্রবলক প্রয়োগ করে থাকেন। আর শিখন সংক্রান্ত সঠিক উত্তর দান করলে, সঠিকভাবে কোন চিত্রাঙ্কণ করতে পারলে, সমস্যার সমাধান করতে পারলে শিক্ষক ইতিবাচক প্রবলক প্রয়োগ করেন। এর ফলে ঐ উত্তরটি বা সম্পাদন করা কাজটি তার কাছে স্থায়ী **রূপ** পায়। স্কিনারের পদ্ধতি অনুযায়ী সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়টি ছোট ছোট অংশে সাজিয়ে নিতে হয়। তাদের একটি ক্রমপর্যায় এমনভাবে স্থির করে নিতে হয় যে প্রথমটি শেখা হলে তবেই দ্বিতীয়টি শেখা যায়। সুতরাং প্রতিটি ধাপ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তার প্রবলন হওয়া প্রয়োজন। প্রবলক প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াটিকে বলাা হয়েছে প্রতিসংকেত। সুতরাং প্রবলক প্রয়োগ করা আর প্রতি সংকেত প্রদান প্রায় সমার্থক। এই কাজে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা দরকার।

- একই প্রবলক বার বার প্রয়োগ করলে তার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা ক্রমশ কমে। সুতরাং প্রবলক প্রয়োগে বৈচিত্র্য থাকা দরকার।
- প্রতিটি সঠিক আচরণের পর প্রতি সংকেত দেওয়া দরকার (যেমন, ঠিক অথবা ভুল) কিন্তু প্রবলকের প্রয়োজন নেই (যেমন, প্রত্যেকবারই প্রশংসাসূচক ভাষা ব্যবহার করার দরকার নেই)।
- একই প্রবলক সমস্ত ছাত্রছাত্রীর কাছে সমান মূল্যবান নয়। একটি ভালো ছাত্রের কানে 'খুব ভালো' কথাটি যতটা প্রশংসা বহন করে, একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রের কাছে তার প্রবলনমূল্য অনেক বেশি।
- পাঠ শুরুর আগেই স্থির করে নিন কী ধরণের প্রবলক প্রয়োগ করবেন, প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে কতটা অভিনব করে তুলবেন।
- অবাঞ্ছিত **আচরণের** বেলায় (যেমন, ভুল উত্তর, দুষ্টুমি বা গোলমাল করা) **নীরবতা** ও চোখে চোখ রাখা প্রবলক হিসাবে ভালো কাজ করে।
- অবাচনিক প্রবলক (মুখ ও শরীরের ভাষা) যথেষ্ট কার্যকর হতে পারে।

- ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবলক প্রয়োগ করার অভ্যাসও তৈরি করুন।

৩.৫.৪ সারসংক্ষেপ করার দক্ষতা (Skill of Summarization)

পাঠ শুরু করার সময় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে অগ্রিম ধারণা দেওয়া হয়েছিল পাঠ শেষে সমগ্র অংশটির সারসংক্ষেপ তৈরি করার সময় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা দরকার। সেজন্য কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে পারেন।

- প্রাথমিকভাবে বিষয়বস্তুর যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল এবং যে কার্যসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের একে একে তুলে ধরতে বলুন।
- পাঠশেষে কোন কোন অংশে সেটি শেখা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে শুনে নিয়ে তাদের লিখতে বলুন এবং নিজেও লিখুন (যেমন, ঘোষিত সূচিতে ছিল কোন কিছুর সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা হবে। এবার ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে সংজ্ঞাটি কী)।
- বিষয়বস্তুর সারাংশ তৈরি করার সময় যতবেশি সম্ভব ছাত্রছাত্রীকে অংশগ্রহণ করতে দিন। নির্মিতিবাদের নীতি অনুযায়ী সঠিক অথচ হুবহু প্রতিলিপি নয় এরকম বক্তব্যগুলিকেও **মর্যাদা** দিন।
- সারাংশ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের মতামত নিন। কারও কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করতে চেষ্টা করুন।
- সারাংশ সংরক্ষণ করার স্পষ্ট নির্দেশ দিন। বাড়িতে সারাংশ তৈরি করার গৃহকৃত্য (Home Task) দেবেন না। গৃহকৃত্য প্রয়োগমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- উপযুক্ত ক্ষেত্রে সারাংশের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটান।

৩.৫.৫ প্রশ্ন করার দক্ষতা (Skill of Questioning)

প্রশ্নোত্তর ছাত্র-শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্র পারস্পরিক আদান প্রদান ও শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে ক্লাসে কোন প্রশ্নোত্তর নেই সেই ক্লাস শিখনের অনুপযোগী। শিক্ষক নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতও ভিন্ন রকম। একজন শিক্ষক প্রশ্ন করায় এবং প্রশ্নোত্তর পর্বকে পরিচালনা করায় কতটা দক্ষ তার উপর **নির্ভর** করে তার সাফল্য। শিক্ষক যে সমস্ত উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন তার কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল।

- শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা কতটা ও কী কী জানে তা ঠিক করার জন্য।
- ছাত্রছাত্রীদের কৌতুহল ঔৎসুক্য বৃদ্ধির জন্য।
- ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য।
- তাদের কাছ থেকে প্রতি সংকেত পাওয়া এবং তাদের প্রতি সংকেত দেওয়ার জন্য।
- সারাংশ তৈরীর জন্য।
- তাদের প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

- প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন ইত্যাদি।

প্রশ্ন করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আপনি –

- প্রশ্নের ভাষা স্পষ্ট, সহজ ও সংক্ষিপ্ত করুন।
- কোন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক প্রশ্ন করবেন না।
- প্রশ্নের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্নের ভাষা ঠিক করুন।
- প্রশ্ন একজন বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীকে লক্ষ করে করবেন না। সাধারণভাবে সমস্ত ক্লাসকে প্রশ্ন করুন।
- প্রশ্ন অযথা বার বার পুনরাবৃত্তি করবেন না।
- প্রশ্নের ভাষা বুঝতে না পারলে প্রশ্নের ভাষাটি পরিবর্তন করুন কিন্তু প্রশ্নের বিষয়বস্তু ঠিক রাখুন।
- একজন ব্যর্থ হলে, অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করুন। সে সঠিক উত্তর দিলে ব্যর্থ ছাত্রটিকে আবার জিজ্ঞাসা করুন (সহপাঠীর মাধ্যমে শিখনের উদাহরণ)।
- কোন ছাত্র প্রশ্ন করলে প্রথমেই নিজে উত্তর না দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদেরই সুযোগ দিন। তাদের কেউ বলতে না পারলে, নিজে উত্তর দিন।

৩.৫.৬ উদাহরণ দেওয়ার দক্ষতা (Skill of Citing Examples)

শিক্ষণের ক্ষেত্রে উদাহরণের ভূমিকা সকলেরই জানা। একটি সঠিক উদাহরণ যত সহজে কোন বক্তব্যকে পরিস্কার করে অনেক বক্তৃতাতেও তা হয় না। সেজন্য শিক্ষকরা ক্লাসে নানারকম উদাহরণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সমস্ত শিক্ষক উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমান দক্ষ নন। অনেকেই উদাহরণ দেওয়ার সময় পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা একটি বা দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। উদাহরণ দেওয়ার জন্য যে নীতিগুলি গ্রহণ করবেন তার কয়েকটি নিচে দেওয়া হল।

- **উদাহরণের** উদ্দেশ্য অর্থাৎ আপনি কেন উদাহরণ দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকা **দরকার**
- বইয়ের উদাহরণ ছাড়াও আরও নতুন ও অভিনব উদাহরণ দিতে চেষ্টা করুন।
- ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের সাহায্যে উদাহরণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। তাদের উদাহরণ দিতে উৎসাহিত করুন।
- বক্তব্য পরিস্ফূট করার জন্য উদাহরণ অনেক সময়ই ব্যাখ্যা সহ দেওয়ার **দরকার** হয়।
- আরোহী সিদ্ধান্তের জন্য যত বেশি সম্ভব উদাহরণ দিন এবং ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে আহ্বান করুন।
- তুলনা বা বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য উদাহরণের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।
- কোন নিয়মের সর্বজনীনতা ও ব্যতিক্রম বোঝানোর জন্য সতর্ক হয়ে উদাহরণ সংগ্রহ করুন।
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া উদাহরণকে বিশেষ মর্যাদা দিন।
- পাঠ শুরু করার জন্য উদাহরণগুলি পূর্বদিনের পাঠ থেকে শুরু করে নতুন পাঠের বিষয় স্পর্শ করে **নির্বাচন করুন।**

৩.৫.৭ সহায়ক উপকরণ তথা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা (Skill of using Teaching Aids and Black Board)

শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching Aid) ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার বিধি একযোগে উল্লেখ করার কারণ ব্ল্যাকবোর্ডও একটি সহায়ক উপকরণ। সাধারণভাবে সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করার কয়েকটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনারা মোটামুটি সচেতন। যেমন,

- বৈচিত্র্য সৃষ্টি।
- বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করা।
- উদ্দীপকের বৈচিত্র্য ও মনোযোগ আকর্ষণ।
- সময় সংক্ষেপ করা।
- মনোবিজ্ঞান সম্মত শিখন।
- বর্ণনার দৃশ্যরূপ প্রদর্শন।

এরকম আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। বলা বাহুল্য উদ্দেশ্যগুলির মধ্যেই কিছুটা পরিমাণে এদের ব্যবহারের নীতিগুলি লক্ষ্য করা যায়। তবে কয়েকটি নীতি বিশেষভাবে জানা দরকার।

ব্ল্যাকবোর্ডের ক্ষেত্রে –

- ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট এবং সকলের দৃষ্টিগোচর হওয়া চাই।
- প্রয়োজনমত ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করুন। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন না।
- ব্ল্যাকবোর্ডে লাইন সোজা রেখে লিখুন। বানান সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন। শিক্ষকের হস্তাক্ষর ছাত্রছাত্রীর কাছে আদর্শ স্বরূপ। সুন্দর হাতের লেখা তাদের শ্রদ্ধা জাগায়।
- যে ছবি বা বিষয় চার্ট বা অন্যভাবে প্রদর্শন করা যায় তা ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না (যেমন, ম্যাপ দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকলে, আবার সেটি বোর্ডে আঁকার দরকার নেই। অবশ্য যদি কোন অংশ বিশদ করার জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে ভিন্ন কথা।
- ব্ল্যাকবোর্ডে সুশৃংঙ্খলভাবে ও উদ্দেশ্য ঠিক করে লিখুন।
- লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সাহায্য নিন।
- **অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু মুছে ফেলুন।**

অন্য উপকরণ –

- চার্ট, মডেল, প্রভৃতি এমনভাবে রাখুন যা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।
- চার্টে ব্যবহৃত রঙ উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া দরকার। লেখা স্পষ্ট, পাঠযোগ্য ও দৃষ্টিগোচর হওয়া দরকার।

- কোন শ্রেণির জন্য সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে সেই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন থাকুন।
- ছাত্রছাত্রীদের আঁকা, লেখা, ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পার।
- কোন বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করা হলে তার ব্যবহার বিধি এবং যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে আগে থেকেই জেনে রাখুন। ব্যবহার করতে যেয়ে বাধার সম্মুখীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।
- সজীব নমুনা, আঞ্চলিকভাবে পাওয়া জিনিষ, সংগৃহীত জিনিষ সহায়ক উপকরণ হিসাবে আকর্ষনীয় কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় তা সতর্কতার সঙ্গো ব্যবহার করা দরকার।
- **যখন প্রয়োজন তখনই উপকরণ ব্যবহার করা উচিত**

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ২ (Check Your Progress – 2)

১) পাঠ শুরু করার দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

____

____

____

২) বক্তৃতাদানের পূর্বে কোন কোন বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার?

____

____

৩) প্রতিসংকেত কথাটির অর্থ কী?

____

____

৪) প্রশ্ন করার দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

ক)______________________________

____

খ)______________________________

____

৫) প্রশ্ন করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আপনি কী করবেন? দুটি বিষয় লিখুন।

ক) ______________________________

____

খ) ______________________________

____

৬) ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের দুটি সতর্কতা উল্লেখ করুন।

৭) শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের দুটি সতর্কতা উল্লেখ করুন।

৩.৬ সারসংক্ষেপ (Let Us Sum up)

শিখনের তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন ও শিক্ষণের সম্পর্ক এই দুই বিষয়ের উপর নির্ভর করে শিক্ষককে শিক্ষণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে আচরণ করেন তার সার্থকতা নির্ভর করে বহুসংখ্যাক দক্ষতার উপর। শিক্ষণের ঐসব দক্ষতা যে কোন একজন শিক্ষককে অর্জন করতে হয় সঠিকভাবে শিক্ষণের জন্য। দক্ষতার অর্থ, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে কোন বিশেষ কাজের পটুত্ব অর্জন। অন্যদিকে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে শিখন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে আচরণ করেন তাই হল শিক্ষণের দক্ষতা। শিক্ষণের দক্ষতা জটিল ও তা বহু দক্ষতার সমন্বয়। শিক্ষণের দক্ষতা নানা প্রকারের হয়। যেসব দক্ষতার সাহায্যে শিক্ষক নিজের বিষয় ও পেশা সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারেন সেগুলকে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা। শিক্ষার্থীর মধ্যে আনন্দ, আগ্রহ ও বিষয়বস্তুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি, তাদের ভয় ও উদ্বেগ দূর করার জন্য যে ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলিকে বলা হয় অনুভব মূলক দক্ষতা। আবার শিক্ষকের শারীরিক ভাষা কার্যসম্পাদন করার দক্ষতা, এইসব মিলিত ভাবে সঞ্চালনমূলক দক্ষতা তৈরি হয়।

এছাড়াও প্রত্যক্ষণ ও মনোযোগদানের দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও ভাববিনিময়ের দক্ষতাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানিক চিন্তার প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা ও ধরে রাখা, সামাজিক আদান প্রদান ও সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা ছাড়াও ভাষা ও ভাষাবিহীন শারীরিক ভঙ্গিমা আমাদের মনোভাবকে অন্যের কাছে তুলে ধরে। শিক্ষণের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হল ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষকের বক্তব্য বিষয় সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। সেইজনই এইসব দক্ষতাগুলি শিক্ষকের অর্জন করা আবশ্যিক।

শিক্ষণের জন্য শ্রেণীকক্ষে দক্ষতাগুলির প্রয়োগ করার জন্য যতগুলি দক্ষতা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি আলাদাভাবে চর্চা ও আয়ত্ত করতে হয়। কয়েকটি **আবশ্যকীয়** দক্ষতা হল, পাঠশুরু করার দক্ষতা, পাঠ চলাকালীন বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা দেওয়ার দক্ষতা, প্রবলন তথা প্রতি সংকেত প্রয়োগের দক্ষতা, সার সংক্ষেপ করার দক্ষতা, প্রশ্ন করার দক্ষতা, উদাহরণ দেওয়ার দক্ষতা এবং সহায়ক উপকরণ তথা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা। প্রত্যেকটি দক্ষতা প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়।

৩.৭ অনুশীলনী (Unit end Exercise)

১) *নিচের প্রশ্নগুলি দুই একটি বাক্যে উত্তর দিন (অনধিক ৬০টি শব্দে)।*

ক) দক্ষতা কাকে বলে?

খ) শিক্ষণের দক্ষতা কাকে বলে?

গ) দক্ষতার যে কোন দুটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিন।

ঘ) শিক্ষণের দক্ষতার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিন।

ঙ) প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা কী?

চ) অনুভবমূলক দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ছ) সঞ্চালনমূলক দক্ষতা কাকে বলে?

ঝ) শরীরের ভাষা বলতে আপনি কী বোঝেন?

ঞ) শিক্ষণ শুরু করার দক্ষতা প্রয়োগের একটি নীতি বলুন।

ট) প্রতি সংকেত ও প্রবলকের মধ্যে পার্থক্য কী?

ঠ) ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দুটি নীতি উল্লেখ করুন।

ড) প্রশ্নের গুরুত্ব কী? দুটি দুইরকম প্রশ্ন লিখে উত্তর দিন।

ঢ) উদাহরণদানের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

২) *নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ (অনধিক ১৫০টি শব্দে)।*

ক) শিক্ষণের দক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

খ) প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা ও অনুভবমূলক দক্ষতা সম্বন্ধে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

গ) সঞ্চালনমূলক দক্ষতার গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

ঘ) প্রত্যক্ষণ ও মনোযোগদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ঙ) বক্তৃতা ও ব্যাখ্যাদানের নীতিগুলি আলোচনা করুন।

চ) প্রশ্ন করার দক্ষতা প্রয়োগের নীতিগুলি কী কী?

ছ) সারাংশ তৈরি করার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

জ) উদাহরণ দানের দক্ষতা কী? এর প্রয়োজনীয়তা কী?

৩) *নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিনঃ (অনধিক ২৫০টি শব্দে)।*

ক) দক্ষতা ও শিক্ষণের দক্ষতা কাদের বলে? এদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

খ) শিক্ষণের দক্ষতা কয়প্রকার? যে কোন তিনপ্রকার দক্ষতার উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

গ) শিক্ষণের দক্ষতাগুলি প্রয়োগ করার নীতিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩.৮ উত্তর সংকেত (Hints to Answer)

অগ্রগতি যাচাই – ১

১) প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি শিক্ষাদানের যে পটুত্ব অর্জন করেন তাকে বলা হয় শিক্ষণের দক্ষতা (৪.৩ অংশ)।

২) যেসব মানসিক দক্ষতার সাহায্যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে তাকে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনমত তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেন তাকে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা (৪.৪.২ অংশ)।

৩) (ক) বোর্ডে লেখা ও ছবি আঁকা।

(খ) দেহের ভাষায় ভাব প্রকাশ করা (৪.৪ অংশ)।

৪) বাচনিক দক্ষতায় ভাষার মাধ্যমে সঠিক মনোভাব প্রকাশ করা আর অবাচনিক দক্ষতার সাহায্যে ইঙ্গিত ও দেহের ভাষায় সঠিক ভাব প্রকাশ করা যায় (৪.৪.৬ অংশ)।

অগ্রগতি যাচাই – ২

১) পাঠ শুরু করার দক্ষতার উপর পরবর্তী সময়ে পাঠের সাফল্য ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রেষণা ইত্যাদি নির্ভর করে (৪.৫.১ অংশ)।

২) পাঠের উদ্দেশ্য, ঘোষিত সূচি ও সময়সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

৩) প্রশ্নোত্তর বা অন্যান্য পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে শিখন সম্বন্ধে অবহিত করা এবং নিজে অবহিত হওয়ার নাম প্রতিসংকেত (৪.৫.৩ অংশ)।

৪) (ক) ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের মূল্যায়ন।

(খ) তাদের মনে প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা (৪.৫.৫ অংশ)।

৫) (ক) প্রশ্ন সহজ, স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় করতে হবে।

(খ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্নের ভাষা ঠিক করতে হবে।

৬) ব্লাক বোর্ডের লেখা অর্থবহ হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় লেখা মুছে ফেলতে হবে। শিক্ষার্থীদের লিখে নিতে বলতে হবে।

৭। শিক্ষনীয় বিষয়ের সাথে শিক্ষা উপকরণ সম্পর্ক যুক্ত হবে। ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

পাঠ একক - ৪

বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন কৌশল

(Different Teaching-Learning Techniques)

গঠন (Structure)

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ শিক্ষণের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

৪.৪ দলগত শিখন

- ৪.৪.১ প্রকল্প ভিত্তিক কাজ
- ৪.৪.২ ব্রেইন স্টর্মিং
- ৪.৪.৩ ভূমিকাভিনয়
- ৪.৪.৪ নকল লোকসভা
- ৪.৪.৫ বিতর্কসভা

৪.৫ সহযোগিতামূলক ও যৌথ শিখন

৪.৬ সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখন

৪.৭ ব্যক্তিমুখি শিখন

- ৪.৭.১ স্ব-শিখন
- ৪.৭.২ স্ব-শিখনের উপযোগী দক্ষতা
- ৪.৭.৩ পাঠাগারে পড়া

৪.৮ কম্পিউটার সহযোগে শিখন

- ৪.৮.১ কম্পিউটারের ব্যবহার

৪.৯ সারসংক্ষেপ

৪.১০ অনুশীলনী

৪.১১ উত্তর সংকেত

৪.১ সূচনা (Introduction)

শিখন ও শিক্ষণের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পূর্ববর্তী দুটি এককে (একক ১ এবং ২) আপনারা পরিচিত হয়েছেন। সাধারণভাবে কিছু কিছু শিক্ষণ কৌশলের সঙ্গেও আপনারা পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু প্রায় শতাব্দীকাল যাবৎ পৃথিবীর নানা প্রান্তে শিক্ষক ও শিক্ষাবিশারদরা অনেক রকম শিক্ষণ কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং এগুলির গুণাগুণ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে এরকম কয়েকটি কৌশলের সঙ্গে পরিচয় থাকলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপনারাও এগুলি প্রয়োগ করে দেখতে পারবেন। কৌশলের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা এক রকম নয়। কোনও কোনও কৌশলের বেলায় শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য, কোথাও কিছুটা বেশি। এইসব কৌশল প্রধানত দুই প্রকার। কিছু কৌশল দলগত শিখন ভিত্তিক আর

কিছু কৌশল ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিখন ভিত্তিক প্রয়াসের উপর গঠিত হয়েছে। এই কৌশলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল। পরবর্তী একক ৪এ শিক্ষণের দক্ষতা সম্বন্ধে আপনি আরও কিছু তথ্য জানতে পারবেন।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- দলগত শিখনের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দলগত শিখনের বিশেষ কয়েকটি কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।
- কৌশলগুলি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরে সহযোগিতা মূলক ও যৌথ শিখনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাক্তিমুখী শিখন কৌশলগুলির ধারণা দিতে পারবেন।
- কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারবেন।

৪.৩ শিক্ষণের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Learner Centred Approach in Teaching)

আধুনিক শিক্ষার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য শিশুকেন্দ্রিকতা (Child centricism) । পাঠক্রম, শিক্ষণপদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি সবকিছুর কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থী। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে। কাজেই একথা বলা বাহুল্য যে বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রিয় বিষয় শিশুর পুর্ণাঙ্গ বিকাশ। শিক্ষকের পক্ষে সেজন্য জানা আবশ্যক যে শিক্ষণের শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কী বোঝায়।

- ➢ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণের উপাদান হিসাবে বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাস হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ভর করে শিশুর বিকাশে বিষয়বস্তুটি কতটা সাহায্য করবে। অন্ততপক্ষে ঐ বিষয়টি শিশুর বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। বাইগটস্কির তত্ত্বে এই কথা প্রাধান্য পেয়েছে।
- ➢ শিক্ষণের জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলিও শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও দক্ষতার উপযোগী হয়ে থাকে। কোন একটি বিশেষ শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching Aid) হয়ত আকর্ষনীয় এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় কিন্তু শিশুদের পক্ষে তা ব্যবহার করে দেখা সম্ভব নয়। এই উপকরণকে প্রকৃত শিশুকেন্দ্রিক বলা চলেনা।
- ➢ শিক্ষণ পদ্ধতির বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। যে বয়সে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়া যে রকম, শিক্ষণ পদ্ধতিও সেইরকম হওয়া আবশ্যিক। পিঁয়াজের তত্ত্বে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।
- ➢ মূল্যায়ন ব্যবস্থাও শিশুর শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিশুদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অচল।

  সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদা কতটা মেটে তারই উপর যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। ছোটদের শারীরিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা, তাদের নিরাপত্তা ও একাত্মতার চাহিদা, ভালোবাসা পাওয়ার ও দেওয়ার চাহিদা, বৌদ্ধিক সক্রিয়তার ক্রমিক বিকাশের সুযোগ ইত্যাদির পাশাপাশি স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক জীবনযাপনের চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয় শিক্ষার মাধ্যমে।

এই কারণে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবেই শিশুকেন্দ্রিক। উপরের সবকয়টি বিষয়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। এবার দরকার শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রকৃতি কী। প্রাথমিকভাবে তাত্ত্বিক নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে। পরে আমরা শিক্ষণ কৌশলগুলির বিকাশ সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করব।

নিচের সারণিতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তিটি তুলে ধরা হল।

তত্ত্ব	মূল প্রতিপাদ্য বিষয়	শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ
পাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন	● স্বাভাবিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়াকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা। ● নতুন উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটানো।	● শিশুদের স্বাভাবিক কৌতুহল বেশি। তারা হাতের কাছে যা পায় তা খুলে, আলাদা করে দেখতে চায়। এই স্বাভাবিক কৌতুহলকে শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করে বহু সঞ্চালন মূলক দক্ষতা শেখানো যায়। ● অভ্যাসমূলক আচরণ আয়ত্ত করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাণের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু। যেমন, সময়ানুবর্তিতা, শৃংখলাপরায়ন আচরণ ইত্যাদি।
স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন	● প্রবলক হিসাবে কোন সন্তোষজনক অভিজ্ঞতাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা। ● শিক্ষার্থীকে উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে প্ররোচিত করা। ● প্রবলন প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রতিক্রিয়াটিকে স্থায়ী আচরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।	● শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলা শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ। ● শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার ফল যাতে সন্তোষজনক বা আনন্দদায়ক হয় তার আয়োজন করা। ● সঙ্গে সঙ্গে প্রতিসঙ্কেত (Feedback) দিয়ে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া। ● শিশুর শিখনের যে স্বাভাবিক গতি আছে তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে নিজের শিখন প্রক্রিয়া নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেওয়া।
অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন	● প্রত্যক্ষণের তিনটি প্রধান নীতি (নৈকট্য, সাদৃশ্য এবং পরিচিতি) কিছু সংখ্যাক উদ্দীপককে নক্সা হিসাবে সংগঠিত করে। ● শিখনের উপাদানগুলিকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করা এবং সংগঠিত নক্সা হিসাবে সংরক্ষণ করা। ● সংগঠন প্রত্যক্ষণ একটি হঠাৎ আবিস্কারের প্রক্রিয়া।	● বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংগঠন আছে সেটির দিকে ইঙ্গিত করে সেটি প্রত্যক্ষণ করতে সাহায্য করা। ● সমগ্র ধারণা থেকে অংশ বিশেষের দিকে শিক্ষণের গতি রাখা। ● বিভিন্ন অংশের মধ্যে সাদৃশ্য আবিস্কারে সাহায্য করা। ● একই ধরনের বিষয়কে একত্রে পড়ানো। ● শিক্ষার্থীর পরিচিত ও অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্যকে কাজে লাগানো।

পিয়াজেঁর বিকাশমূলক তত্ত্ব	• বিভিন্ন বয়সে শিশুর জ্ঞানের সংগঠন (স্কিমা) ভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি হয়। • স্কিমার পরিবর্তন হয় নতুন তথ্যের আত্তীকরণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে।	• শিক্ষকের কাজ স্কিমার সংগঠনে সাহায্য করা। • প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বাস্তব ও সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনের সুযোগ দেওয়া।
ব্রুনারের অনুসন্ধিৎসার প্রশিক্ষণ ও আবিস্কার মূলক শিখন	• শিক্ষার্থী শিশুরা প্রত্যেকেই একজন আবিস্কারক। তাদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাকে অবলম্বন করেই শিখন সম্ভব। • ইন্দ্রিয়জ, ক্রিয়ানুষ্ঠান ভিত্তিক ও প্রতীকী অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শিশুরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। • দলগতভাবে আবিস্কার প্রক্রিয়া একক প্রচেষ্টা থেকে বেশি কার্যকর।	• প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী • তিন রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া। • অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিশুদের তথ্য সংগ্রহে প্রশিক্ষিত করে তোলা। • তথ্য থেকে (অবরোহী পদ্ধতিতে) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা। • শিক্ষকের ভূমিকা আয়োজক ও সহায়ক হিসাবে, তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে নয়।
বাইগটস্কির সামাজিক নির্মিতিবাদ	• সামাজিক বিকাশ ও কৃষ্টিগত ভিত্তির উপর শিশুর শিখন ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া নির্ভর করে। • শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের মানকে সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে না নিয়ে তার চেয়ে কতটা, প্রগতি সম্ভব তা নির্ণয় করতে পারলে তার বিকাশকে কিছুটা ত্বরান্বিত করা সম্ভব। • এই বিকাশ প্রক্রিয়াই শিখনের ভিত্তি।	• শিক্ষককে জানতে হবে শিশুর সামাজিক ও কৃষ্টিগত ভিত্তিটি কী। • একটি শিশুর শিখন সামর্থের সীমা (সন্নিহিত বিকাশের সীমা) স্থির করতে হবে তার সামাজিক ভিত্তি অনুযায়ী। • শিক্ষকের কাজ সহায়ক হিসাবে তার বিকাশের উন্নয়ন ঘটানো।

মনে রাখতে হবে উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রয়োগের সামান্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। প্রাথমিক স্তরে শিখণ যে সমস্ত দিক দিয়েই শিশুকেন্দ্রিক সেটুকু তুলে ধরাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য।

৪.৪. দলগত শিখন (Group Learning)

যখন একদল শিক্ষার্থী একত্রে এমন একটি কার্যক্রম গ্রহণ করে যা তাদের যে কোন একজনের পক্ষে কষ্টসাধ্য এবং ঐ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য কোন বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ তখন তাকে বলা হয় দলগত শিখন। বিগত পঞ্চাশ বৎসর বা তারও কিছু বেশি সময় যাবৎ শিক্ষাবিদ্রা দলগত শিখনের উপকারিতার উপর জোর দিয়ে আসছেন। আপনারা ইতিপূর্বে দেখেছেন ব্রুণার তাঁর অনুসন্ধান ও আবিস্কার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের কথা বলেননি, দলগত অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। দলগত শিখনের জন্য যে সব কৌশল নির্মিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে জানার আগে আমরা বিচার করে দেখব দলগত কৌশল কেন সুবিধাজনক।

দলগত শিখন কৌশলের সুবিধা –

- দলের প্রত্যেকে শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সেজন্য উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে সকলেই শিখতে পারে।
- প্রত্যেকেই নিজ নিজ শিখন সামর্থ্যঅনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ায় কিছু না কিছু ভূমিকা পালন করে। এরফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরা লাভবান হয় এবং যারা অগ্রসর তারাও তাদের শিখন ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে।
- শিখন প্রক্রিয়ায় কখনও একঘেয়েমি আসেনা।
- প্রত্যেকেই নিজের মত করে জ্ঞানের সংগঠন নির্মাণ করে নিতে পারে কিন্তু তা তথ্যের দিক থেকে কখনই অসম্পূর্ণ থাকে না।
- নেতৃত্বের স্বাভাবিক বিকাশ হয়, এবং শৃংখলাবোধ তৈরি হয়।
- সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সকলের সমান। সেজন্য সকলেই নতুন উদ্যম লাভ করে। একক ব্যক্তির ব্যর্থতা অনেক সময় নিরুৎসাহের কারণ হয়।
- শিখনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। কারণ একজনের যা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তা অন্যের নজরে পড়ে।
- ভুলভ্রান্তি নিজেরাই পারস্পরিকভাবে সংশোধন করে নিতে পারে। এতে সঙ্কোচ বা বিব্রতবোধ করার কোন কারণ থাকে না।
- শিখনের মান উচ্চ হয়।
- শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

দলগত শিখনের এই সুবিধাগুলি সবকিছু সব কৌশলের বেলায় পাওয়া যায় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দলগত শিখন ফলপ্রসূ। তবে দলগত শিখনের কয়েকটি সমস্যাও আছে। যেমন,

- দলগত শিখন পাঠক্রমের সমস্ত অংশের ক্ষেত্রে সমান কার্যকর নয়।
- দলের মধ্যে সকলে সমান দায়িত্ব না নিলে বা দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে।
- কোন কোন শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
- দল পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার বিকাশ হয় ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সময় সময় সমস্যার সৃষ্টি করে।
- প্রথাগত মূল্যায়ন ব্যবস্থা অচল। দলগত মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রয়োগ করা দরকার। সামাজিক ও মানসিক প্রস্তুতি পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক কারও ক্ষেত্রেই দলগত মূল্যায়নের অনুকূল নয়।

কয়েকটি দলগত শিখন কৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

৪.৪.১ প্রকল্প ভিত্তিক কাজ (Project Work)

শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে প্রকল্প গ্রহণ কোন নতুন পদ্ধতি নয়। যখন শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহ করে একটি সুপরিকল্পিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করে তখন তাকে এক কথায় বলা হয় প্রকল্প (Project)। কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) নামক শিক্ষা বিজ্ঞানী প্রথম এই পদ্ধতি প্রচলন করেন। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিধিবদ্ধ প্রকল্প পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের উপযোগী প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সম্বন্ধে জানা থাকলে আপনারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার প্রয়োগ করতে পারবেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী কী। যদি পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়ভিত্তিক কোন প্রকল্প হয় তবে প্রকল্পের মাধ্যমে কোন কোন শিখন সামর্থ, দক্ষতা ও তথ্য শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

প্রকল্প পরিকল্পনা

প্রকল্প গঠন অর্থাৎ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজের পরিকল্পনা স্থির করে নিতে হবে এমনভাবে যে শিক্ষার্থীরা পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অনুকূলে কাজ করতে পারবে।

প্রকল্পের জন্য দলগঠন

বড় প্রকল্প হলে তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নেওয়া দরকার এবং কোন ক্লাসের সমস্ত শিক্ষার্থীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক একটি দলের উপর এক একটি অংশের ভার দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রীকেই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। যেমন, পরিবেশ শিখন সংক্রান্ত কোন প্রকল্প অথবা আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন প্রকল্প, ইত্যাদি।

তথ্যের প্রকৃতি ও পদ্ধতি

প্রকল্পের জন্য কী ধরনের কী কী তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা স্থির করে নিতে হবে এবং সেই সব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যবে সেটাও ঠিক করে নিতে হবে। যেমন, স্থানীয় জীব বৈচিত্র সম্বন্ধে প্রকল্পে কোন দল পাখি, কোন দল কীটপতঙ্গ, কোন দল জলচর প্রাণী ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কাজে নামল। তার আগে তারা স্থির করে নিল, প্রাণির নাম, চেহারার বর্ণনা এবং কোথায় বসবাস করে, সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু পদ্ধতি হিসাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়াও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (তাঁদের জিজ্ঞাসা করে) নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি স্থির করে নেওয়া হল।

তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য একত্র করে কী কী পাওয়া গেল, কোথায় অসম্পূর্ণ থাকল **এসব** দেখে নেওয়া দরকার।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পাওয়া তথ্য একত্রিত করে তা থেকে কী কী বিষয় জানা গেল, সে সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করা দরকার।

৪.৪.২ ব্রেইন স্টর্মিং (Brain Storming)

সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার চর্চা ও চূড়ান্ত বিকাশের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল। পদ্ধতিটি W.J.J. Gordon প্রবর্তিত Synectic পদ্ধতির একটি রূপান্তর। প্রথমে এই পদ্ধতিগুলি বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যাঁরা ব্যবস্থাপক (Manager) তাদের কর্মদক্ষতা, দ্রুত সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বাড়ানোর জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও এদের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে পদ্ধতিতে ব্রেইন স্টর্মিং বড়দের বেলায় প্রয়োগ করা হয় তা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। একটি অপেক্ষাকৃত সরল রূপে ব্রেইন স্টর্মিং এর পরিকল্পনা করা দরকার। এই পদ্ধতিরি বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে দেওয়া হল।

- ব্রেইন স্টর্মিং ছোট দল নিয়ে শুরু করতে হয়।
- দলের বৈঠক (Brain Storming Session) নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে করা হয়।
- বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য কোন সমস্যার সমাধান করার যতরকম প্রকারভেদ হতে পারে তার আবিস্কার।
- বৈঠকের সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সক্রিয়ভাবে সমাধানের অনুকূলে কিছু-না-কিছু বলা বাধ্যতামূলক।
- পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই এমন পন্থা বা ধারণা (Idea) বলবেন, যা অন্য কেউ বলেনি।
- ধারণাটি প্রথম প্রথম আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও কিছু আসে যায় না।
- একজন পর্যবেক্ষক থাকেন, যিনি সবকিছু লিখে নিতে থাকেন।
- বারবার এরকম করা হলে একসময় প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সমাধান সূত্র একাধিক সংখ্যায় বেরিয়ে আসে।
- শেষে সেগুলির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শেষের পর্যায়টি ব্রেইন স্টর্মিং এর অন্তিম ফল, অংশ নয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাচ্ছলে ব্রেইন স্টর্মিং এর বৈঠক করা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য অবশ্য একই থাকবে। অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক সৃজনশীলতা, কল্পনা এবং তাদের উপযোগী সমস্য সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি। সেইসঙ্গে সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে দলবদ্ধ শিখনের আনন্দলাভ। ছোটরা যে অন্তাক্ষরী জাতীয় খেলা খেলে তা একদিক থেকে দেখতে গেলে ব্রেইন স্টর্মিং এর সরলতম রূপ। তারা এই খেলা যথেষ্ট উপভোগ করে এবং সেজন্য এই খেলাকে পরিকল্পিতভাবে শিখনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম নেওয়া দরকার।

- ছোট দল নির্বাচন করা।

- কোন একটি বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য শিক্ষক ঠিক করে নেবেন। যেমন, শব্দভান্ডারের সমৃদ্ধি (vocabulary), প্রচলিত বিষয়ের রূপান্তর, ভৌগলিক তথ্য, অথবা অনুরূপ যেকোন বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে।
- দলগত খেলা হলেও ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির কথা মনে রেখে দলগতভাবে নয়, এককভাবে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- মোট সময়সীমা ও একজনের প্রতিক্রিয়া জানানোর সময়সীমা স্থির করতে হবে। অর্থাৎ একজনের বলা হলে, অন্যজন দীর্ঘসময় পরে প্রতিক্রিয়া জানালে চলবে না।
- পর্যায়ক্রম স্থির করতে হবে। এবং অন্যান্য নিয়মাবলি তাদেরই ঠিক করে নিতে উৎসাহিত করতে হবে।

শিক্ষক শুধু খেলাটি বুঝিয়ে দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে বিষয়বস্তু স্থির করে দিয়ে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। কোন বিতর্ক উপস্থিত হলে তা মিটাতে সাহায্য করবেন।

৪.৪.৩ ভূমিকাভিনয় (Roleplaying)

ছোট ছোট **ছেলেমেয়েরা** স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়া হিসাবে নিজে নিজেই নানারকম ভূমিকা নিয়ে অন্যের আচরণের অনুকরণ করে। তারা স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে শিক্ষিকার ভূমিকা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, মা বা বাবার ভূমিকা নিয়ে খেলা করে, অথবা কখনও বা ড্রাইভার, ফেরিওয়ালা ইত্যাদির ভূমিকাও গ্রহণ করে। সুতরাং ভূমিকাভিনয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকার দরুন তাদের দলবদ্ধভাবে শিখন সহায়ক ভূমিকাভিনয়ে উৎসাহিত করা খুবই সহজ। ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক পাঠের সময় অতি সহজেই ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করা যায়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠে ডাক্তার, রোগী, অভিভাবক প্রভৃতি ভূমিকা সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যবিধি শেখানো খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

ভূমিকাভিনয়ের সুবিধা –

- আনন্দদায়ক ও স্বতঃস্ফূর্ত শিখন।
- বিষয়বস্তুর তাৎপর্যটি সহজেই অনুধাবন করা।
- বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিখনকে মিলিয়ে দেওয়ায় শিখন স্থায়ী হয়।
- সৃজনশীলতার চর্চা হয়।
- নানা প্রকার স্বাভাবিক বৈচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগ।
- দলবদ্ধ শিখনের অভ্যাস হয়।

ভূমিকাভিনয়ের একমাত্র সমস্যা একসঙ্গে সকল ছাত্রছাত্রীকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে অন্যরা নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকে। দর্শক ও অংশগ্রহণকারীর শিখনের মান এক নাও হতে পারে।

৪.৪.৪ নকল লোকসভা (Mock Parliament)

নকল লোকসভাও একপ্রকার ভূমিকাভিনয়। লোকসভা কয়েকটি বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে। লোকসভার কাজ আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ। প্রধানতম পদ্ধতি হল, মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেশ করা হয়, প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভোটের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সভার কাজ পরিচালনা করেন স্পীকার। তাঁর নির্দেশ সকলকেই মেনে চলতে হয়।

প্রাথমিকস্তরের ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে লোকসভার জটিল কার্যক্রম খেলাচ্ছলেও অনুকরণ করা কঠিন। কারণ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই তাদের ধারণার বাইরে। তবে উচ্চপ্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির কিছুটা প্রয়োগ সম্ভব। বিশেষত যে সব শ্রেণিতে পৌরবিদ্যা (Civics) অন্যতম পাঠ্য বিষয় সেখানে নকল লোকসভার আয়োজন করে কোন সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শেখানো যেতে পারে। তবে প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য।

৪.৪.৫ বিতর্কসভা (Debate)

এটি একটি বহুল প্রচলিত শিখন পদ্ধতি। এর প্রধান উদ্দেশ্য বিতর্কের মাধ্যমে তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ ঘটানো এবং শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তথ্য সংগ্রহ করার দক্ষতা, যুক্তিসহকারে অপরের মত খন্ডন করা এবং বিতর্কের মধ্যে দিয়েই একটি মীমাংসামূলক সিদ্ধান্তে আসা। প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব (Cognitive conflict) নামক একটি বিষয়ের কথা বলেন। যা প্রকৃত পক্ষে আগেকার জানা বিষয়ের সঙ্গে নতুন তথ্য বা জ্ঞানের পার্থক্য, বৈপরীত্য অথবা বিরোধ। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হলে প্রজ্ঞার সংগঠন পরিবর্তন হয়না। জ্ঞানের ভান্ডারে নতুন তথ্য যুক্ত হয় না।

বিতর্কসভায় সচেতনভাবে একধরনের প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়। প্রথমে এমন একটি বিষয় বেছে নেওয়া হয় যেটির যথার্থতা সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। অর্থাৎ পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির পাল্লা প্রায় সমান। এই বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিতে থাকেন দুই দলে বিভক্ত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা। পর্যায়ক্রমে একজন পক্ষে এবং একজন বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। সভার পরিচালক তখন পক্ষে ও বিপক্ষের তথ্য ও যুক্তির তুলনামূলক বিচার শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন এবং সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করেন।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা কোন সহজ বিষয় নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষত যে সব বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই সংশয় আছে, সেইসব বিষয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বিতর্ক সভা বিশেষ কার্যকর।

৪.৫ সহযোগিতামূলক ও যৌথশিখন (Co-operative and Collaborative Learning)

বর্তমানকালে সমস্ত স্তরের মানুষের মুখে প্রায়ই প্রতিযোগিতার কথা শোনা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে অন্যকে পরাস্ত করে নিজে যত প্রথম সারির দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই সমাজে বেশি প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় তাঁরা মনে করেন প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে প্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং ছোটবেলা থেকেই প্রতিযোগিতার মনোভাব জন্মালে তারা আরও বেশি শিখবে এবং আরও বেশি পরিশ্রম করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার মনোভাব শিখনে কোন সাহায্য করে না। বিশেষভাবে যাদের সক্ষমতা মাঝামাঝি তারা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত ভালো ফল করে, তারপর হাল ছেড়ে দেয়। এই জন্যই সহযোগিতামূলক ও যৌথ শিখন তাঁদের মতে সবচেয়ে ভালো শিখন পদ্ধতি।

সহযোগিতামূলক শিখন কথার অর্থ নিজে শেখা এবং সেইসঙ্গে সহপাঠীদের শিখতে সাহায্য করা অথবা শেখার উপযোগী সহায়তা দান। বিপরীতক্রমে প্রতিযোগিতামূলক শিখন অন্যের বিষয়ে উদাসীন থাকে অথবা সর্বদাই সচেষ্ট থাকে যেন নিজের শিখন ও প্রস্তুতির কথা কেউ জানতে না পারে।

ক্লাসের সমস্ত শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা এররকম নয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক পরিবেশ, ও বিকাশের মান এক প্রকার নয়। সেজন্য শিক্ষক যা বলেন বা যেভাবে শেখাতে চান, তা সমস্ত ছাত্রছাত্রীর বোধকে সমানভাবে উদ্দীপিত করেনা। এই জন্য শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ কার্যকর। সহযোগিতা মূলক ও যৌথ শিখনের মধ্যে প্রভেদ সামান্যই। যৌথ শিখন কথার অর্থ একত্রে যৌথভাবে কোন কাজ সম্পাদনকরা, বোঝার চেষ্টা করা এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে একত্রে পড়া। সহযোগিতামূলক শিখন বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দুই ধরনের শিখন কীভাবে হতে পারে, নিচে তার কয়েকটির আভাস দেওয়া হল।

- ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময়।
- নিজের জানা তথ্য সহপাঠীদের জানানো।
- নিজের সংগৃহীত নমুনা, পাঠ্য উপকরণ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করা।
- একত্রে তথ্য সংগ্রহ করা।
- পাঠ্যাংশের এক একটি এক একজন তৈরি করার দায়িত্ব নিয়ে তারপর পারস্পরিক আলোচনা ও বিনিময়।
- একজনের ভুল অন্যে সংশোধন করে দেওয়া।
- যার যে জায়গায় দুর্বলতা, সেই জায়গায় সাহায্য করা।
- ব্যর্থতার সময় সাহস ও উদ্যম যোগানোর চেষ্টা করা।

এরকম আরো অনেক হতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ১ (Check Your Progress – 1)

১) দলগত শিখন কথাটির অর্থ কী?

____

____

____

২) দলগত শিখনের দুটি সুবিধা উল্লেখ করুন।

ক) ____

____

খ) ____

____

৩) প্রকল্প কাকে বলে?

____

____

____

৪) ব্রেইন স্টর্মিং এর একটি সুবিধা লিখুন।

____

____

____

৫) বিতর্ক সভার জন্য কী ধরনের আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করা উচিত?

____

____

____

৪.৬ সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখন (Peer Learning)

এই কথাটির একটি ভিন্নতর রূপ হল সহপাঠীদের দ্বারা শিক্ষণ (Peer tutoring)। সুদূর অতীতে আমাদের গ্রামীণ পাঠশালাগুলিতে এই ধরনের একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। পাঠশালাগুলি সাধারণত একক শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হত। কোন নির্দিষ্ট শ্রেণি বিভাগ ছাত্রদের মধ্যে থাকত না। দৈনন্দিন প্রয়োজন মত হিসাব, অঙ্ক,

ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি যা কিছু শেখানো দরকার তা শিক্ষক (গুরুমশাই) স্থির করতেন। অর্থাৎ কোন বাঁধাধরা পাঠক্রম এইসব পাঠশালায় থাকত না। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কখনও কখনও শিক্ষকের উপস্থিতিতেও অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেদের শিক্ষার ভার থাকত কোন বড় ও অগ্রসর ছেলের উপর। এই প্রথার নাম মনিটর প্রথা (Monitor System)।

সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখন বা সহপাঠীদের দ্বারা শিক্ষণ কথাটি মনিটর প্রথায় ব্যবহৃত অর্থ থেকে কিছুটা ভিন্ন। কোন কারণেই ছাত্র বা ছাত্রী বিশেষ শিক্ষকের স্থান অধিকার করতে পারে না। অর্থাৎ কোন একজন সহপাঠী শিক্ষকের বিকল্প নয় পরিপূরক মাত্র। ক্লাসের মধ্যে শিক্ষকের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাষার বাধা ও বোঝাপড়ার অভাবে অনেক সময়ই শিক্ষক তাঁর ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীর মনের কাছে পৌঁছতে পারেন না। তাঁরা যা বলতে চান তা কিছু কিছু ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব হয়না। তখন যারা শিক্ষকের কথা ঠিক ঠিক বুঝেছে, শিক্ষক যদি সচেতনভাবে তাদের সাহায্যে অন্যদের প্রজ্ঞার সংগঠনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারেন এবং নতুন তথ্য শেখাতে পারেন তবে দুই ছাত্রই সমানভাবে লাভবান হয়। একজন তার প্রজ্ঞার সংগঠনটি দৃঢ় করে নিতে পারে এবং অপরজন একা একা যে সংগঠন তৈরি করতে পারছিল না তার শিখন সম্পন্ন নয়। সহপাঠীদের পারস্পরিক এই যে আদান প্রদান, তা শিখনের পক্ষে এক পরম সহায়ক হাতিয়ার। একেই বলা হয়েছে সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখন। এই সাহায্য সচেতন ও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষকের কয়েকটি করণীয় কাজ আছে।

- শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সক্ষমতার মান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখবেন।
- ক্লাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতার প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা থাকা দরকার।
- তিনি কোন কিছু শেখা হলে ক্লাসের মধ্যেই যে সব কৃত্য (Task) ছাত্রছাত্রীদের করতে দেন, সেগুলি যৌথভাবে দুজন বা তিনজন ছাত্রকে একযোগে করার জন্য উৎসাহ দিতে পারেন। বিশেষভাবে যেগুলি সমস্যা সমাধান মূলক কাজ সেগুলির ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য।
- এককভাবে কাজ করা হলেও সেগুলি পরস্পর বিনিময় করে তাদের মূল্যায়ন ও আলোচনা করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- প্রথমে দুজন বা তিনজন ছাত্রকে আলোচনা করতে দিয়ে তারপর স্বতন্ত্রভাবে কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে সহপাঠীদের পরস্পরের শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারেন।

৪.৭ ব্যক্তিমুখি শিখন (Individualized Learning)

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের শিখন প্রধানত ব্যক্তিমুখি। অর্থাৎ তারা একা একাই নিজের পাঠ তৈরি করে। প্রজ্ঞার নির্মিতিবাদে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মত করে জ্ঞানের সংগঠন নির্মাণ করে। সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ব্যক্তিমুখি শিখন অতি স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় শিখন প্রক্রিয়া। ব্যক্তিমুখি শিখন কথাটির অর্থ একা একা পাঠ তৈরি করে নিজেকে প্রস্তুত করা নয়। ব্যক্তিমুখি শিখন সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে

শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিখনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা তৈরি হয়। সেজন্য ব্যক্তিমুখি শিখনের কয়েকটি রকমফের সম্বন্ধে জানা দরকার। এই প্রকারভেদগুলি একে অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা নয়।

৪.৭.১ স্ব-শিখন (Self Learnig)

যখন অপর কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার সংরক্ষণ করে একজন ব্যক্তি নিজে নিজেই শিক্ষা লাভ করে তখন তাকে বলা হয় স্ব-শিখন। আপনারা এই পুস্তকটি পড়ে যখন নিজে নিজেই শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কার্যকরী শিক্ষালাভ করছেন – এটি একটি স্ব-শিখনেরই উদাহরণ। স্ব-শিখন যে শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করা বা জ্ঞান লাভ করার জন্যই কার্যকর তা নয়। কোন সঞ্চালনমূলক দক্ষতা অর্জনের জন্যও স্ব-শিখন প্রক্রিয়া বিশেষ উপযোগী। যেমন, নতুন মোবাইল ফোন কিনে, সঙ্গে যে পুস্তিকাটি দেওয়া আছে সেটি পড়ে নিয়ে আপনি মোবাইল ফোন ব্যবহারের কৌশল শিখতে পারলেন। স্ব-শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর,

- নিজে শেখার উৎসাহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং ক্রমশ সে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।
- শিখনের জন্য অন্যের সাহায্য না নেওয়াতে সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত শিখতে পারে।
- কোন প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে সারাদিন সময় না দিলেও চলে।

স্ব-শিখনের জন্য যেসব পাঠ্যপুস্তক বা অনুরূপ সহায়িকা তৈরি করা হয় তা সাধারণত সংক্ষিপ্ত, ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ও তথ্য ভিত্তিক হয়ে থাকে।

কিন্তু স্ব-শিখনের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্ব-শিখন প্রক্রিয়া যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সেজন্য আমাদের জানা দরকার স্ব-শিখনের উপযোগী দক্ষতাগুলি কী কী।

৪.৭.২ স্ব-শিখনের উপযোগী দক্ষতা (Self Learning Skill)

যে দক্ষতাগুলি অর্জন করলে অন্যের (যেমন, শিক্ষক) প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই নিজেকে একজন চির-শিক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তোলা যায়, সেগুলিকেই বলা হয় স্ব-শিখনের উপযোগী দক্ষতা। এইসব দক্ষতা প্রথাগত শিক্ষা বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই সমান কার্যকর। স্ব-শিখনের জন্য যে সব দক্ষতা অর্জন করা দরকার তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল।

- **তথ্য বাছাই করার ক্ষমতা** – বিপুল পরিমাণ তথ্যের মধ্যে থেকে কোন নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিকে আলাদা করার ক্ষমতা।
- **তথ্য জারণের দক্ষতা** – তথ্যকে কত দ্রুত এবং সাফল্যের সঙ্গে সংরক্ষণ করার উপযোগী করে জারণ করা যায় সেই বিষয়ক দক্ষতা। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী একে বলেছেন দক্ষতার স্বতঃক্রিয়তা

(Automatization of skill)। এর অর্থ কতটা স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করা যায় তার দক্ষতা।

- **দ্রুত অর্থবোধ করা** (Speed of Comprehension)– নিজে পড়ে বা শুনে তার অর্থবোধ করার ক্ষমতা চর্চা করলে বাড়ানো যায় এবং তা স্ব-শিখনের পক্ষে একান্ত সহায়ক। কোন বড় পাঠ্যাংশের সারমর্ম তৈরি করা, তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা, কোন বর্ণনা বা গল্পের শিরোনাম দেওয়া এসবের মধ্যেদিয়ে অর্থবোধের দক্ষতা জন্মায়।
- **মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা** – দীর্ঘ সময় ধরে কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা স্ব-শিখনের জন্য একটি অতি আবশ্যকীয় দক্ষতা।
- এছাড়াও যুক্ত হওয়া দরকার ধৈর্য, অনুসন্ধিৎসা ও সহনশীলতা।

৪.৭.৩ পাঠাগারে পড়া (Library Study)

পাঠাগারে পড়ার জন্য উপরোক্ত দক্ষতাগুলির সব কয়টি প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে জানা দরকার পাঠাগার ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধেও। পাঠাগারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এখানে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অনেক সহায়ক পুস্তক থাকে। নিজের শিখনের ভান্ডার সমৃদ্ধি করার জন্য ঐসব সহায়ক পুস্তকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক স্তরে পাঠাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা নানা রকম আকর্ষনীয় গল্প, কবিতা ইত্যাদির বই সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলে, পরবর্তীকালে স্ব-শিখনের চর্চা হয়। **এছাড়াও** পাঠাগার ব্যবহারের অভ্যাস তৈরি হলে তার মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধের বিকাশ হতে পারে।

৪.৮ কম্পিউটার সহযোগে শিখন (Computer Assisted Learning)

বর্তমানকালে কম্পিউটার শিখনের অন্যতম প্রধান শিখন সহায়ক যন্ত্র। কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন কথাটির অর্থ তিনটি বিশেষ পর্যায়ে শিখন।

- শিক্ষনীয় বিষয়ের উপস্থাপন। অর্থাৎ শিক্ষক যেভাবে ক্লাসে কোন বিষয়বস্তুকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেন তার চেয়েও সুশৃংখল ও সুনির্দিষ্টভাবে শেখার উপযোগী করে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে পারে কম্পিউটার।
- বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, দৃষ্টান্ত দেওয়া, নমুনা প্রদর্শন ইত্যাদি কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে করা যায়।
- মূল্যায়ন ও প্রতিসংকেত তাৎক্ষণিকভাবে কম্পিউটার তৎপরতার সঙ্গে করতে পারে।

৪.৮.১ কম্পিউটারের ব্যবহার (Uses of Computer)

কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের নানা প্রকারভেদ বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

- কম্পিউটারের সাহায্যে একই সঙ্গে দ্বৈত মাধ্যম অর্থাৎ দৃষ্টি ও শ্রবণ সংবেদনের সমন্বয়ে শিখন সম্ভব হয়। কম্পিউটারের মনিটরে দৃশ্যবস্তু ও তার সঙ্গে ভাষ্য যোগ করে একটি বিষয় সম্বন্ধে শিখন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। Allan Paivio প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন শুধুমাত্র দৃষ্টি সংবেদন বা শ্রবণ সংবেদনের সাহায্যে গৃহীত তথ্য সংরক্ষিত হলে যতটা স্থায়ী হয় উভয় প্রকার সংবেদনের একযোগে প্রয়োগ হলে, শিক্ষার্থীরা দুই প্রকার মানসিক প্রতিরূপ (দৃষ্টি ও শ্রবণ) একত্রিত করে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করতে পারে। একে বলা হয় Multimedia Learning। অবশ্য দৃশ্যরূপের যত প্রকারভেদ হতে পারে (লেখা, গ্রাফ, সচলচিত্র ইত্যাদি) তার সংমিশ্রণও এর বৈশিষ্ট্য।
- কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষার্থী তার নিজের মত করে বিষয়বস্তু বাছাই করে নিয়ে শিখতে পারে। এবং নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা দ্রুত তার পক্ষে শেখা সম্ভব সেই অনুযায়ী শিখতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম পরিকল্পিত শিখন (Programmed Learning)। পরিকল্পিত শিখনের পরিকল্পনা করেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। কম্পিউটারের স্মৃতিতে পরিকল্পনা (Programme) সংরক্ষিত হলে তাকে যতবার খুশি ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতির সুবিধা –
    - ➢ একটিমাত্র ধাপ শেখা হলে তবেই পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া যায়।
    - ➢ শিখনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীর পক্ষে নিজে নিজেই যাচাই করার সুযোগ থাকে।
    - ➢ যাচাই করার ফলাফল প্রতিসংকেত (Feedback) সঙ্গে সঙ্গেই কম্পিউটার থেকে পাওয়া যায়।
    - ➢ শেখা না হলে, যেকোন ধাপ পুনরাবৃত্তির সুযোগ থাকে।
- কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলি, ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের চিত্ররূপ সৃষ্টি করে তাকে দৃশ্যমান করা যায়। সেই সঙ্গে প্রকৃত পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেও শুধু বিশেষ প্রোগ্রাম অনুসরণ করে নিজে নিজেই নকল পরীক্ষা সম্পন্ন করে শিক্ষালাভ করা যায়। একে বলা হয় কৃত্রিম বাস্তবতা (Virtual reality)। কোন প্রাকৃতিক ঘটনার নকল অনুকৃতি (যেমন, পাহাড়ের ধস, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ) কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা স্বচক্ষে দেখতে পারে। একে বলা হয় Computer Simulation।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ২ (Check Your Progress – 2)

১) সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে সহপাঠীদের প্রকৃত ভূমিকা কী?

২) স্ব–শিখনের যে কোন দুটি সুফল বলুন।

ক)

খ)

৩) স্ব-শিখনের জন্য দ্রুত অর্থবোধ হওয়ার দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪) নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধের সঙ্গে পাঠাগারের পড়ার সম্পর্ক কী?

৫) কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের সুবিধাগুলি কী কী?

৪.৮.২ CD ROM ও তার ব্যাবহার (CD-ROM and its uses)

ROM কথাটি Read Only Memory এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কম্পিউটারের স্মৃতি দুরকম – প্রাথমিক স্মৃতি ও গৌণ স্মৃতি। প্রাথমিক স্মৃতি আবার দুই প্রকার।

- শুধুমাত্র পাঠয্যেগ্য স্মৃতি বা Read Only Memory অর্থাৎ এই ধরণের প্রাথমিক স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য কম্পিউটারের মনিটরে পাঠ করা যায় এবং যা নানারকম বাধ্যতামূলক নির্দেশ পালন করে।
- RAM বা Ramdom Access Memory এর সাহায্যে কম্পিউটার সমস্ত নির্দেশাবলি পালন করতে পারে।

গৌণ স্মৃতি বলতে বোঝায় যখন নানাভাবে স্মৃতি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, ম্যাগনেটিক টেপ, ফ্লপি ডিস্ক ইত্যাদি। যখন কোন তথ্য কম্প্যাক্ট ডিস্কে (Compact Disc or CD) সংরক্ষণ করা হয়, এবং ঐ তথ্য কম্পিউটারের সাহায্যে পাঠ করা যায় তখন তাকে বলা হয় CD ROM অর্থাৎ কমপ্যাক্ট ডিস্কে সংরক্ষিত শুধুমাত্র পাঠযোগ্য স্মৃতি।

প্রচলিত কথায় যে কোন তথ্যই কমপ্যাক্ট ডিস্কে ধরে রেখে তা প্রয়োজন মত Central Processing Unit (CPU)এ ঢুকিয়ে তথ্যটির পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়াই CD ROM। এই কারণেই শিখনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং CD ROM এর ব্যবহার একজন শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থীর সমান প্রয়োজনীয়। কম্পিউটার সহযোগে শিখনের সমস্ত পদ্ধতি ও প্রকরণই এর সাহায্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন,

- কোন Multimedia Programme সংরক্ষিত করে পরে তার ব্যবহার করা।
- কোন পরিকল্পিত শিখনের পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম একইরকমভাবে ব্যবহার করা।
- কৃত্রিম বাস্তবতা সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরি করা এবং তাকে সংরক্ষিত করা।

যেসব তথ্য মানুষের স্মৃতিতে অবিকল ধরে রাখা সম্ভব নয় সেগুলিও কমপ্যাক্ট ডিস্কে ধরে রাখলে তা স্থায়ী ভাবে থাকে। এক্ষাড়াও মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম, স্ব-শিখনের উপযোগী সমস্ত বিষয়, যে সব বিষয় শিক্ষকের পক্ষে বার বার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয় সমস্ত তথ্যই CD তে সংরক্ষিত হতে পারে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর গুরূত্ব বেশি। **উচ্চারণ**, উচ্চারণ স্থান, ধ্বনি ও স্বরের বিশ্লেষণ, ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে CD ROM সাহায্য করতে পারে।

৪.৯ সারসংক্ষেপ (Let us Sum up)

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকেন্দ্রিক শিখন ও শিক্ষণের বিষয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মনোবিজ্ঞানীরা শিখন-শিক্ষণ কৌশলগুলি চিহ্নিত করেছেন। দেখা গেছে দলগতভাবে শিখন ও এককভাবে শিখন দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

যখন শিক্ষকের উদ্যোগে অথবা নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শিক্ষালাভ করে তখন তাকে বলা হয় দলগত শিখন। দলগত শিখনের সুবিধার মধ্যে আছে, শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি, বৈচিত্র, জ্ঞানের নির্মিতি, নেতৃত্বের বিকাশ, সফল ও ব্যর্থতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ ইত্যাদি। দলগত শিখনের ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর অসুবিধার অন্যতম হল, এটি পাঠক্রমের অংশ বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য, দায়িত্ববোধের অভাবজনিত সমস্যা, আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্যা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্যা। দলগত শিখনের একটি কার্যকরী কৌশল হল প্রকল্পভিত্তিক কাজ। যখন শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করে একটি সুপরিকল্পিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ করে শিক্ষাগ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় প্রকল্প। প্রকল্প পদ্ধতির স্তরগুলি হল, প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্থির করা, প্রকল্প গঠন, প্রকল্পের জন্য দলগঠন, তথ্যের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রকল্পের শেষে এই সবকিছু একত্রিত করে একটি বিবরণী তৈরী করা হয়।

আর একটি দলগত কৌশল হল, আলোচনা। এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা তাদের অভিজ্ঞতা, তথ্য, মতামত ইত্যাদি অন্যদের সামনে তুলে ধরে এবং শেষে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নতুন শিক্ষালাভ হয়। আলোচনার ফলে শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা, অন্যের মতামত শোনার দক্ষতা, ধৈর্য ও শৃংখলাবোধ বাড়ে। শিখন স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়।

ব্রেইন স্টর্মিং নামক দলগত পদ্ধতিতে দলের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সভ্যের পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যামূলক বিষয় নিয়ে ব্রেইন স্টর্মিং এর আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে একই সমস্যার নানা বিকল্প সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে। ব্রেইন স্টর্মিং এর ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও যুক্তি প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভূমিকাভিনয় নামক দলগত শিখন কৌশলের বেলায় কোন কাল্পনিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদির পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে এক একজন ছাত্রছাত্রীকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করতে দিলে শিখন প্রক্রিয়া সকলের কাছেই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আরও দুটি দলগত শিখন কৌশলের নাম নকল লোকসভা ও বিতর্কসভা। সহযোগিতামূলক ও যৌথ শিখন প্রক্রিয়া দলগত শিখনের আর একটি **প্রকৃষ্ট** পন্থা। এছাড়াও সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখনও দলগত শিখনের অন্যতম কৌশল।

ব্যক্তিমুখি শিখনের অর্থ এককভাবে পড়া, কাজ করা ও শেখা। একপ্রকার ব্যক্তিমুখি শিখনের নাম স্ব-শিখন। স্ব-**শিখনের** অর্থ অন্য কারও প্রত্যক্ষ সাহায্য না নিয়ে নিজের উদ্যোগে শিখন। স্ব-শিখনের জন্য কয়েকটি দক্ষতার প্রয়োজন, যেমন, তথ্য বাছাই করার দক্ষতা, তথ্য জারণের ক্ষমতা, দ্রুত অর্থবোধ করা, মনোযোগ দেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি। পাঠাগারে পড়া, কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন একক শিখনের অন্যতম কৌশল। কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখনকে বলা হয় কম্পিউটার সহযোগে শিখন, যে কাজের জন্য দরকার হয় CD ROM নামক স্মৃতি সংরক্ষন ব্যবস্থা। কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন কৌশলের অন্যতম হল, Multimedia, পরিকল্পিত শিখন, Computer Simulation ইত্যাদি।

৪.১০ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

১) *নিচের প্রশ্নগুলির দুই একটি বাক্যে উত্তর দিন (অনধিক ৬০টি শব্দে)।*

ক) দলগত শিখন কাকে বলে?

খ) প্রকল্প পদ্ধতি প্রচলন করেন কে?

গ) আলোচনা ও প্রকল্পের দুটি পার্থক্য লিখুন।

ঘ) নকল লোকসভা কী?

ঙ) এমন একটি বিষয়ের উদাহরণ দিন, যেখানে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

চ) সহপাঠীদের মাধ্যমে কোন ক্ষেত্রে শিখন হতে পারে?

ছ) স্ব-শিখন কী?

জ) পাঠাগারের পড়া কেন একটি স্ব-শিখন কৌশল?

ঝ) কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের একটি সুবিধা বলুন।

ঞ) CD ROM কথাটির অর্থ কী?

২) *নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।(অনধিক ১৫০টি শব্দে)।*

ক) দলগত শিখনের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

খ) প্রকল্প ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়?

গ) ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে শিখনের বিবরণ দিন।

ঘ) আলোচনা ও বিতর্ক সভার তুলনা করুন।

ঙ) সহপাঠীদের মাধ্যমে কীভাবে শিখন হতে পারে আলোচনা করুন।

চ) স্ব-শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

ছ) CD ROM ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে বিরণ দিন।

৩) *নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।(অনধিক ২৫০টি শব্দে)।*

ক) দলগত শিখন কাকে বলে? দলগত শিখনের পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

খ) ব্যক্তিমুখি শিখন ও দলগত শিখনের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

গ) স্ব-শিখনের পদ্ধতিগুলির বর্ণনা দিন ও তাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার মতামত দিন।

৪.১১ উত্তর সংকেত (Hints to Answer)

অগ্রগতি যাচাই – ১

১) একদল শিক্ষার্থী যখন একত্রে কোন একটি বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগে শেখে, তখন তাকে বলে দলগত শিখন (৪.৪ অংশ)।

২) (ক) দলের প্রত্যেকেই শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, সেজন্য সকলেই শিখতে পারে। (খ) সাফল্যের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার দায় সকলে ভাগ করে নিতে পারে (৪.৪ অংশ)।

৩) সুপরিকল্পিত কার্যক্রম অনুসরণ করে কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার প্রক্রিয়াকে বলে প্রকল্প (৪.৪.১ অংশ)।

৪) অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই তথ্য বা ধারণা দান করে। এর ফলে প্রত্যেকেরই সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (৪.৫ অংশ)।

৫) যে বিষয়ে মতভেদ আছে এমন বিষয় বিতর্কসভার উপযোগী (৪.৪.৫ অংশ)।

অগ্রগতি যাচাই – ২

১) পারস্পরিক সাহায্য দান। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সক্ষম ছাত্র দুর্বল সহপাঠীকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে সে নিজে শিখতে পারে (৪.৬ অংশ)।

২) (ক) নিজের গতি অনুযায়ী শেখা সম্ভব হয়। (খ) নিজের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (৪.৭.১ অংশ)।

৩) দ্রুত অর্থবোধ করতে পারলে, শিখনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীর প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (৪.৭.২ অংশ)।

৪) নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পাঠাগারের বই দেওয়া নেওয়া করতে হয় এবং পাঠাগারে পড়তে হয়। এর মধ্যে দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ জন্মায় (৪.৭.৩ অংশ)।

৫) (ক) শিক্ষার্থী নিজেই বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারে। (খ) নিজের গতিতে ধাপে ধাপে শিখতে পারে। (খ) নিজের মূল্যায়ন নিজেই করতে পারে (৪.৭.১ অংশ)।

PWD Act, 1995 প্রাথমিক স্তরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা
Education of Children with Special Needs at Primary Level with reference to PWD Act, 1995

গঠন **(Structure)**

৫.১ সূচনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিবিভাগ

৫.৪ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ

৫.৪.১ দৃষ্টি অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ

৫.৪.২ শ্রবণ অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ

৫.৪.৩ মৃদু মানসিক অক্ষমতা যুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ

৫.৫ সর্বান্তর্ভূক্তির পরিবেশে সমস্ত শিশুর শিক্ষাদান

৫.৫.১ প্রাথমিক স্তরে সর্বান্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষণ কৌশল

৫.৬ সারসংক্ষেপ

৫.৭ অনুশীলনী

৫.৮ উত্তর সংকেত

৫.১ সূচনা (Introduction)

বিদ্যালয়গামী সমস্ত শিশুদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন কিছু অক্ষমতার শিকার যে তারা সাধারণ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষার অতিরিক্ত কিছু সাহায্য তাদের প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজন মিটলে তারা সমাজের অন্য সকলের মতই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। এইসব শিশুকে বলা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। দীর্ঘকাল ধরে এদের ভিন্ন স্কুলে, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিয়ে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। সেজন্য সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা যায়নি। কারণ, শিক্ষকের অভাব, যথেষ্ট সংখ্যক স্কুলের অভাব, অর্থাভাব ইত্যাদি।

সম্প্রতি সারা পৃথিবীর মত আমাদের দেশেও এই নীতি গৃহীত হয়েছে যে সকলকেই শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। তারজন্য দরকার এইসব শিশুকে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে সেখানেই তাদের, পড়ার সুযোগ দেওয়া। এই কারণে প্রাথমিক শিক্ষকদের এদের সম্বন্ধে জানা দরকার। বর্তমান এককে তিন ধরণের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর কথা সংক্ষেপে বলা হল – এরা হল, দৃষ্টি অক্ষমতা যুক্ত, শ্রবণ অক্ষমতা যুক্ত, এবং মানসিক অক্ষমতাযুক্ত শিশু।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে আপনি –

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- দৃষ্টি, শ্রবণ ও মৃদু মানসিক অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সর্বান্তর্ভূক্তিকরণের জন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়া আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরে সর্বান্তর্ভূক্তিমূলক শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি স্থির করতে পারবেন।

৫.৩ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Children with Special Need

যে শিশুরা কোন এক প্রকার অক্ষমতার জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই রকমভাবে শিক্ষালাভ করতে পারেনা বিশেষ কিছু আয়োজন হলে পারে, তাদের বলা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। অক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী এদের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

সংবেদন অক্ষমতা (Sensory Impairment)

এদের প্রধান দুটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোন একটি বা দুটিই আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বিকল। যাদের চক্ষু দুটি আংশিকভাবে বিকল তাদের বলা হয় ক্ষীণদৃষ্টি (Visually Impaired), যাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট তাদের বলা হয় অন্ধ (Blind)। বর্তমান পাঠে আমরা সকলকেই বলব দৃষ্টি অক্ষমতা যুক্ত।

যেসব শিশুর শ্রবণ যন্ত্র আংশিক বা সম্পূর্ণ বিকল তাদের বলা হয় বধির (Deaf)। এখানে এদের বলা হয়েছে শ্রবণ অক্ষমতা যুক্ত শিশু (Hearing Impaired)।

চলন সংক্রান্ত অক্ষমতা (Locomotor disabled)

এসব শিশুরা জন্ম থেকে অথবা পরবর্তী কোন দুর্ঘটনা অথবা পোলিও জাতীয় রোগে চলাফেরা ও সঞ্চালনমূলক কাজে অক্ষম। শরীরের হাড়ের কাঠামো কোন কারণে বিকল হলে তাদের বলা হয় অস্থি বিকলাঙ্গতা (Orthopedically Handicapped)। আবার মস্তিষ্কের অংশবিশেষের পক্ষাঘাতের জন্য যারা দেহের কিছু কিছু পেশিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা তাদের বলা হয় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত জনিত অক্ষমতা (Cerebral Palsy)।

মানসিক অক্ষমতা (Mental Handicap)

এদের মধ্যে আছে মানসিক প্রতিবন্ধিতা (Mental retardation) অর্থাৎ যাদের বুদ্ধির কার্যকারিতা কম এবং সামাজিক ও অন্যান্য বিকাশ মন্থর হওয়ার দরুন সমস্তরকম শিখনে আংশিকভাবে অক্ষম। তাছাড়া আছে অটিস্টিক (Autistic) শিশুরা যারা ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক যোগাযোগের বিকাশের ক্ষেত্রে অক্ষম।

প্রজ্ঞামূলক সমস্যা (Cognitive Disorder)
এদের মধ্যে মনোযোগহীনতা এবং সেইসঙ্গে অতি চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা দেয়। সেজন্য এদের শিক্ষা ব্যাহত হয়।
শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) – এদের মধ্যে তিন ধরনের অক্ষমতা দেখা যায় – (ছাপার অক্ষর) পড়ার অক্ষমতা (Reading disability), লেখার অক্ষমতা (Writing disability) এবং গণিত অক্ষমতা (Numerical disability)।
এখানে আমরা তিন প্রকার অক্ষমতা যুক্ত শিশুদের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করব। এই তিন প্রকার শিশুকেই সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রেখে পড়াতে হবে এবং এরা সংখ্যায় অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সর্বাধিক।

৫.৪ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Children with Special Needs)

কোন অক্ষমতা যুক্ত শিশুর অক্ষমতার প্রকৃতি, পরিমাণ ও কারণ সম্বন্ধে জানতে হলে বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। কিন্তু সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ দেখলে আপনারা সহজেই এদের প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন। তারপর প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য এদের পঠন পাঠন বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। তিন প্রকার, অর্থাৎ দৃষ্টি অক্ষমতা, শ্রবণ অক্ষমতা ও মানসিক অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করার লক্ষণগুলি আলাদা।

৫.৪.১ দৃষ্টি অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Children with Visual Impairment)

একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি যে বস্তু ২০০ ফুট দূর থেকে দেখতে পায়, একজন সম্পূর্ণ দৃষ্টি অক্ষম মানুষ তা ২০ ফুট দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পায়না। ২০ ফুটের বেশি কতদূর থেকে দেখতে পায় তার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির দৃষ্টি অক্ষমতার পরিমাণ।
শিক্ষকরা দশটি লক্ষণ দেখে সহজেই দৃষ্টি অক্ষম শিশুকে চিহ্নিত করতে পারবেন। দশটি লক্ষণ সংক্ষেপে –

- ঘন ঘন চোখে জল আসা ও চোখ মোছা।
- চোখ ঘন ঘন লাল হওয়া বা ফোলা।
- ক্লাসের মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরায় বাধা পাওয়া।
- চোখের অস্বাভাবিক নাড়াচাড়া বা দুই চোখের সামঞ্জস্যহীনতা।
- ছোট লেখা, ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়ার অসুবিধা।
- ছবির খুঁটিনাটি দেখতে না পাওয়া।

- কিছুটা পড়ার পর ঝাপসা দেখা।
- মাথা বা শরীর হেলিয়ে দেখার চেষ্টা করা।
- একটি চোখকে বিশেষভাবে ব্যবহার করার ঝোঁক।
- ঘন ঘন মাথাধরা ও চোখের সংক্রমণ।

এক্ষাড়াও যাদের দৃষ্টিহীনতা ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত, যাদের চোখের মণি সাদা বা অনুরূপ লক্ষণ যাদের রয়েছে তারাও আছে।

৫.৪.২ শ্রবণ অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Children with Hearing Impairment)

যাদের শোনার ক্ষমতা এতটাই কম যে চিৎকার করে না বললে ভাষার মাধ্যমে বলা বিষয় কিছুই বুঝতে পারেনা তাদের বলা হয় শ্রবণ অক্ষম। শব্দ পরিমাপক এককের নাম ডেসিবেল (Decibel)। শ্রবণ অক্ষমদের শ্রেণিবিভাগ শ্রবণ ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নরূপ।

মৃদু (Mild) – ২৬–৫৪ dB

সাধারণ (Moderate) – ৫৫–৬৯ dB

প্রবল (Severe) – ৭০–৮৯ dB

ভয়াবহ (Profound) – ৯০ dB বা তার বেশি

নিচের প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলি দিয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা যায়।

- মৌখিক বর্ণনা বা নির্দেশ বুঝতে পারে না।
- বক্তার ঠোঁটের নাড়াচাড়ার দিকে মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে।
- বক্তার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে শোনার চেষ্টা করে।
- কথা কম বলে, বাক্যে কম শব্দ ব্যবহার করে।
- অনেক সময় উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত থাকে।
- ভাষার বিকাশে বিলম্ব হয়।
- পিছন থেকে ডাকলে সাড়া দেয় না।
- মৌখিক কথাবার্তার সময় অমনোযাগী হয়ে পড়ে।
- রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির আওয়াজ সর্বাধিক বাড়িয়ে রাখে।
- সাধারণত নিচুস্বরে কথা বলে।

৫.৪.৩ মৃদু মানসিক অক্ষমতা যুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Children with Mild Mental Retradation)

যাদের বৌদ্ধিক সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কম এবং সেই সঙ্গো শিখন ক্ষমতা, নিজের যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা, সামাজিক দক্ষতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ তাদের বলা হয় মানসিক অক্ষমতাযুক্ত শিশু। এদের মধ্যেও চারটি শ্রেণি আছে।

মৃদু (Mild) – এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০/৫৫ থেকে ৭০/৭৫ পর্যন্ত এবং এরা কিছুদূর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম।

সাধারণ (Moderate) – বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৫/৪০ থেকে ৫৫/৫৫ পর্যন্ত। এরা কোন কাজে প্রশিক্ষণ দিলে শিখতে পারে। সাধারণ কিছু শিক্ষাও এদের দেওয়া যায়।

প্রবল (Severe) – বুদ্ধ্যঙ্ক ২০/২৫ থেকে ৩৫/৪০ পর্যন্ত। সহজ কাজের জন্য প্রশিক্ষণযোগ্য।

ভয়াবহ (Profound) – বুদ্ধ্যঙ্ক ২০/২৫ এর কম। এদের আবেষ্টনীত রাখা প্রয়োজন কারণ এদের প্রতিনিয়ত সাহায্যের প্রয়োজন।

মৃদু প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করার উপযোগী লক্ষণগুলি নিম্নরূপ –

- নিচু ক্লাসে লেখাপড়ায় স্বাভাবিক কিন্তু কিছুটা উঁচুতে ওঠার পর পিছিয়ে পড়ে।
- শিখতে বা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়।
- একসঙ্গো অনেক বিষয় সমান দক্ষতার সঙ্গো পড়তে পারেনা। একটিতে উন্নতি করতে যেয়ে অন্যগুলিতে খারাপ ফল করে।
- অনেক সময়েই পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে হাতের কাজে দক্ষতা দেখায়।
- কারও কারও চেহারায় বিশেষ ধরণের ছাপ থাকে।
- ছোটবেলায় ভাষা ও অন্যান্য বিকাশে দেরি হয়।
- যে কাজ যান্ত্রিকভাবে করা যায় সেগুলি বার বার করতে ভালোবাসে।
- সামাজিক রীতিনীতি শিখতে দেরি হয়।
- কখনও কখনও প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা যায় (যেমন, অতিরিক্ত রাগ)
- অপেক্ষাকৃত ছোটদের সঙ্গো মেলামেশা ও খেলাধূলা করতে ভালোবাসে।

সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হলে মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলে তিনি পরীক্ষা করে বলতে পারবেন শিশুটি প্রকৃতই মানসিক অক্ষমতা যুক্ত কী না।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন - ১ (Check Your Progress – 1)

১) শিখন অক্ষমতা কয় প্রকার ও কী কী?

____

____

____

২) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এরকম নাম দেওয়া হয় কেন?

____

____

____

৩) অটিস্টিক শিশুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

____

____

____

৪) দৃষ্টি অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের পরিমাপ কীভাবে করা হয়?

____

____

____

৫) শ্রবণ অক্ষম শিশুদের শ্রেণিকক্ষে চিহ্নিত করারর জন্য যে কোন তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

ক) ________________________________

খ) ________________________________

গ) ________________________________

৫.৫ সর্বান্তর্ভুক্তির পরিবেশে সমস্ত শিশুর শিক্ষাদান (Teaching All Children in Inclusive Environment)

সম্প্রতি আমাদের দেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। এর ফলে কোন ছেলেমেয়েকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তাদেরও সকলকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হলে সাধারণ বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে একত্রে তাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থার অনেকগুলি সুবিধা আছে। যেমন,

- দেশের দূরদূরান্তরে, ছড়িয়ে থাকা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সকলের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সর্বত্রই আছে। সেখানে ঐসব ছেলেমেয়েদের পড়ার সুযোগ দিলে তবেই প্রকৃত সর্বান্তর্ভূক্তি অর্থাৎ সকলকে শিক্ষার সুযোগের অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হবে।
- সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অল্প কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে তাঁরা এইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে পারবেন। বিপুল সংখ্যক বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করার দরকার হবে না।
- একসঙ্গো লেখাপড়া করলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা সমাজের সঙ্গো একাত্মবোধ করবে। সামাজিক সংহতি বাড়লে তারা নিজেদের বঞ্চিত, অবহেলিত মনে করবে না।
- একসঙ্গো লেখাপড়া ও মেলামেশা করলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও এদের সমস্যাগুলি বুঝতে পারবে। তাদের দূর থেকে সহানুভূতি জানানোর পরিবর্তে নিজেদের মতই একজন হিসাবে তাদের গ্রহণ করতে পারবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বড় হয়ে সামাজিক দায় দায়িত্ব বহন করতে শিখবে। তারা সমাজের বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকবে না। তাদের যতটকু কর্মক্ষমতা আছে তার সবটা কাজে লাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।
- শিক্ষক, প্রশাসক ও অন্যান্যরাও এদের সম্বন্ধে অনুকম্পার বদলে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারবে। এর ফলে সঠিক ভাবে সমাজ ও অর্থনীতি দুইই উপকৃত হবে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীই এক কথায় সর্বান্তর্ভূক্তির পরিবেশ। এই পরিবেশেই সর্বান্তর্ভূক্তির সাফল্যের জন্য শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করে নিতে হবে।

৫.৫.১ প্রাথমিক স্তরে সর্বান্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষণ কৌশল (Inclusive Teaching Strategy at Primary Level)

সর্বান্তর্ভূক্তির জন্য শিক্ষণ কৌশলগুলির রূপরেখা প্রত্যেক প্রকার অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃতন্ত্রভাবে নিচে উল্লেখ করা হল। প্রকৃত কৌশলগুলির জন্য দীর্ঘ অধ্যয়ন প্রয়োজন।

দৃষ্টি অক্ষমতাযুক্তদের শিক্ষা (Education of the Visually Impaired)ঃ

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দূরত্ব কম থাকবে।
- বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দৃশ্য ও শব্দ যথাসম্ভব কম থাকবে।
- অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কমিয়ে চলাফেরা বাধামুক্ত করতে হবে।
- বোর্ডের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা বা Overhead Projector ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- দরজা, দেরাজ ইত্যাদি হয় সম্পূর্ণ খোলা নাহয় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।
- বিশেষ **উচ্চারণভঙ্গী** ব্যবহার করে পড়ানো যথেষ্ট স্পষ্ট করতে হবে।
- কিছু লেখার সময় বা দেখানোর সময় মুখে তার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে হবে।
- অবান্তর বিষয় বা প্রসঙ্গ যথাসম্ভব কমাতে হবে।

- যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে তা যেন ত্রুটিমুক্ত হয়।

এক্ষাড়াও দরকার সহপাঠীদের সাহায্য করার মনোভাব গঠন করা, প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চেষ্টা করা (যেমন, Talking Calculator), বিবর্ধনের সুযোগ রাখা, চলাফেরায় দক্ষতা আনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি।

শ্রবণ অক্ষমতাযুক্তদের শিক্ষা (Education of the Hearing Impaired)ঃ

মৃদু থেকে সাধারণ শ্রবণ অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলি প্রয়োজন।

- শিক্ষক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দূরত্ব যথাসম্ভব কম থাকবে।
- চিৎকার করে কথা না বলে, স্পষ্ট উচ্চারণে, ছোট ছোট বাক্যে এবং প্রতিটি শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলতে হবে।
- চারপাশের হট্টগোল যথাসম্ভব কমিয়ে রাখতে হবে।
- বধিরতার মাত্রা অনুযায়ী এদের বসার ব্যবস্থা করা উচিত।
- যতদূর সম্ভব শিক্ষকের উচিত এদের মুখোমুখি কথা বলা।
- পড়ানোর সময় বা কথা বলার সময় সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা উচিত। এর ফলে বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কথার অর্থ বুঝতে সুবিধা হবে।
- কথাবলার সঙ্গে তার দৃশ্যরূপটি তুলে ধরতে হবে। ইঙ্গিত, ছবি, মডেল এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের নোট থেকে পরে এদের বুঝিয়ে দিতে পারে।
- পড়া, সামাজিক আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিলে ধীরে ধীরে এরা স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।
- শ্রবণ যন্ত্রের **ব্যবহার** ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা দরকার।

বধিরতার মাত্রা অনুযায়ী আরও কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে থাকে যা বিশদ পাঠের মাধ্যমে জানতে হবে।

মৃদু মানসিক অক্ষমতা যুক্ত শিশুদের শিক্ষা (Education of the Mild Retarded Children)ঃ

এদের শিক্ষাদনের জন্য কয়েকটি নীতি অবলম্বন করতে হয়।

- **সক্রিয়তার দক্ষতা (Functional Skill)** – নিজের কাজ নিজে করার দক্ষতা বিকাশের জন্য বাড়িতে ও স্কুলে সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে।
- **বয়সোপযোগী কাজ (Age-specific Activities)** – এদের বিকাশ **বিলম্বিত** হওয়ার ফলে বয়সোপযোগী কাজ করতে পারেনা। সেজন্য কিছু কিছু বয়সোপযোগী সহজ কাজ শেখানো হয়। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা খেলাধূলায় উৎসাহ দেওয়া হয়।
- **স্বতন্ত্রতা (Independence)** – নিজের বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা করা হয়।
- **কর্মদক্ষতা (Work Skill)** – লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু কিছু কর্মদক্ষতার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে মানসিক বিকাশেও সহায়তা হয়।

এদের শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে প্রধান্য দেওয়া হয় –

- **প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা (Pre School Education)** – বিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগী প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা এই স্তরের প্রধান বিষয়। যেমন, (১) নিজের জায়গায় বসা এবং স্থির হয়ে বসা, (২) শোনা ও দেখা অভিজ্ঞতার পার্থক্য করা, (৩) নির্দেশ পালন, (৪) ভাষা ও বাচনিক দক্ষতা, (৫) স্থূল ও সূক্ষ্ম সঞ্চালনমূলক সমন্বয়ের বিকাশ, (৬) নিজের কাজ নিজে করতে পারার শিক্ষা ইত্যাদি।
- **প্রাথমিক শিক্ষা (Elementary Education)** – এই স্তরেরও অনেকটা স্থান জুড়ে থাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা। যেমন, পড়া, লেখা, গণনা করা, সংখ্যাবাচক শব্দ লেখা, তুলনামূলক বিচার, ধারণা গঠন ইত্যাদি। সামাজিক অভিযোজন মূলক দক্ষতার উপরও জোর দেওয়া হয়। অধিকাংশ মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রথম দিকে তিন বছর পড়ার আগে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তখন অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক থাকে। তারপর দুর্বলতা ধরা পড়ে। সেজন্য বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি এদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য রিসোর্স কক্ষে (Resource Room) শিক্ষা দেওয়ার দরকার হয়। রিসোর্স কক্ষ কথাটির অর্থ যেখানে বিশেষ কিছু আয়োজন থাকে এবং বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক (আংশিক সময়ের হলেও ক্ষতি নেই) তাদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

পিতামাতার অংশগ্রহণ (Parent Involvement) – বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা পিতামাতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছাড়া সফল হতে পারে না। এর কারণ বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় তার চর্চা বাড়িতে একমাত্র **পিতামাতাদের** তত্ত্বাবধানেই হওয়া সম্ভব। তাছাড়াও, প্রতিটি শিশুর চাহিদা ও সমস্যার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য খুব বেশি থাকায়, শিক্ষকের পক্ষেও অল্প সময়ের মধ্যে তার সবকিছু বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। এর জন্য দরকার নিয়মিতভাবে শিক্ষক ও পিতামাতার কথা বিনিময়। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

আপনি –

- মা-বাবা কে স্কুলে আসতে উৎসাহিত করুন। প্রথম প্রথম নিজেই যান তাঁদের কাছে।
- তাদের সহজ ভাষায় সমস্যাগুলি বলুন এবং নিজে তাদের কথা শুনুন।
- উভয়ে যৌথভাবে কর্মসূচি ঠিক করুন।
- প্রয়োজন হলে **এইসঙ্গে** কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করুন।

এই বিষয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য যে সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে তাঁরা সহজ ভাষায় খুব সুন্দর সচিত্র নির্দেশিকা প্রকাশ করে থাকেন।

৫.৬ সারসংক্ষেপ (Let us Sum up)

যেসব শিশুর পক্ষে বিশেষ কোন অক্ষমতার দরুণ সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষালাভ করতে পারেনা, কিছু বিশেষ আয়োজন দরকার হয় তাদের বলা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সংবেদন অক্ষমতাযুক্তদের মধ্যে আছে দৃষ্টি ও শ্রবণ অক্ষমতা। চলন সংক্রান্ত

অক্ষমতার মধ্যে আছে অস্থি বিকলাঙ্গতা ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। মানসিক অক্ষমতার অন্তর্গত হল মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অটিস্‌ম। আর প্রজ্ঞামূলক অক্ষমতায় পড়া, লেখা ও গণিতে অক্ষমতা দেখা যায়।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করা যায় বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখে। বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রাথমিক চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয় এইসব লক্ষণ দেখে। দৃষ্টি অক্ষমদের চোখ দিয়ে জল পড়া, চোখ মোছা, লাল হওয়া, দেখার সময় দেহেরভঙ্গী এসব দেখে চেনা যায়। শ্রবণ অক্ষমদের ক্ষেত্রে আরও সরাসরি চেনার সুবিধা কারণ এদের শুনতে, নির্দেশপালন করতে বা পিছন থেকে ডাকলে সাড়া দিতে অসুবিধা হয়। ভাষার বিকাশ বিলম্বিত বা বিকৃত হতে পারে।

মানসিক অক্ষমতাকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয় – মৃদু, সাধারণ, প্রবল ও ভয়াবহ। এর মধ্যে মৃদু মানসিক অক্ষমরা শিক্ষালাভ করার যোগ্য।

আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। সেজন্য অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের যথাসম্ভব সাধারণ বিদ্যালয়ে রেখে পড়ানোর নীতি গৃহীত হয়েছে। কারণ কোন শিশুকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। একেই বলা হয়েছে সর্বান্তর্ভূক্তির নীতি। এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষককেই অক্ষমতাযুক্তদের চিহ্নিত করার শিক্ষা ও তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়া জানতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়ে এইসব শিশুদের শিক্ষালাভ করলে তাদের সঙ্গে সমাজের সংহতি বাড়বে, তারা আর সমাজের বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকবে না।

৫.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

১) *নিচের প্রশ্নগুলির দুই একটি বাক্যে উত্তর দিন (অনধিক ৬০টি শব্দে)* –

ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কাদের বলে?

খ) সংবেদন অক্ষম শিশু কারা?

গ) চলন অক্ষমতা কয় প্রকার?

ঘ) প্রজ্ঞামূলক অক্ষমতার প্রকারভেদগুলি কী কী?

ঙ) দৃষ্টি অক্ষমদের চিহ্নিত করার জন্য দুটি লক্ষণ উল্লেখ করুন।

চ) শ্রবণ অক্ষমদের কীভাবে চিহ্নিত করা যায়? দুটি লক্ষণ বলুন।

ছ) মানসিক অক্ষমতাযুক্তদের কী কী শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?

জ) প্রবল ও ভয়াবহ মানসিক অক্ষমদের বুদ্ধ্যঙ্ক কত?

ঝ) সর্বান্তর্ভূক্তি কথাটির অর্থ কী?

ঞ) প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষায় কোন কোন বিষয়কে প্রধান্য দেওয়া হয়?

২) *নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন(অনধিক ১৫০টি শব্দে) -*

ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিবিভাগের বিবরণ দিন।

খ) দৃষ্টি ও শ্রবণ অক্ষমতা যুক্ত শিশুদের কীভাবে চিহ্নিত করবেন?

গ) সর্বান্তর্ভূক্তির নীতি ও তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) মৃদু মানসিক অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

ঙ) মানসিক অক্ষমদের শ্রেণিবিভাগের বিবরণ দিন।

৩) *নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (অনধিক ২৫০টি শব্দে) -*

ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কাদের বলে? এদের কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়? মানসিক অক্ষমতা ও শ্রবণ অক্ষমতার স্তরগুলি সম্বন্ধে বিবরণ দিন।

খ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করার লক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

গ) সর্বান্তর্ভূক্তির পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? এই নীতি গ্রহণের কারণ কী?

ঘ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

৫.৮ উত্তর সংকেত (Hints to Answer)

অগ্রগতি যাচাই

১) তিন প্রকার। যথা, পঠন অক্ষমতা, লিখন অক্ষমতা ও গণিত অক্ষমতা (৫.৩ অংশ)।

২) এর কারণ এইসব শিশুরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে না। কিছু বিশেষ আয়োজন প্রয়োজন নয় (৫.৪ অংশ)।

৩) এদের সামাজিক যোগাযোগ এবং কথা বলার ক্ষেত্রে বিকাশ জনিত সমস্যা থাকে (৫.৪ অংশ)।

৪) সাধারণত ২০০ ফুট দূর থেকে যে বস্তু দেখা যায় একজন সম্পূর্ণ দৃষ্টি অক্ষম ব্যক্তি তা ২০ ফুট দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পায় না। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব অনুযায়ী দৃষ্টি অক্ষমতার পরিমাপ করা হয় (৫.৪.১ অংশ)।

৫) ক) মৌখিক বর্ণনা বা নির্দেশ বুঝতে পারে না।

খ) বক্তার ঠোঁটের নাড়াচাড়ার দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে।

গ) ভাষার বিকাশে বিলম্ব হয় (৫.৪.২ অংশ)।

পাঠ একক – ৬

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ও সংগতিবিধান (**Mental Health and Adjustment for Teachers and Learners**)

গঠন (Structure)

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারনা

৬.৩.১ শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য

৬.৩.২ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য

৬.৪ সংগতিবিধান

৬.৪.১ সংগতিবিধানের সংজ্ঞা

৬.৪.২ সংগতিবিধানের কৌশল

৬.৫ অপসংগতি

৬.৫.১ অপসংগতির কারণ

৬.৫.২ অপসংগতির প্রতিকার

৬.৬ সারসংক্ষেপ

৬.৭ অনুশীলনী

৬.৮ উত্তর সংকেত

৬.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী এককগুলিতে আপনার শিখন ও শিক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারনা পেয়েছেন। শিক্ষণের জন্য —

অবশ্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলির পরিচয় পাওয়ার পর আপনারা দেখেছেন যেসব শিশুর জন্য বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন তাদের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে রেখে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। বিদ্যালয়ের ও শ্রেণিকক্ষের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থাপনা দরকার সে বিষয়েও সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক ধারনা আপনাদের হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য যা কিছু করা দরকার সে

সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রীর এমন কোন মানসিক সমস্যা থাকে যার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার তা হলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকার কী? শুধু তাই নয় শিক্ষকের নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটু অর্ন্তদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তিনি নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করতে পারেন, আমি যা করছি তা কী ঠিক? সাধারণত একজন শিক্ষকের পক্ষে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার করা কোন সমস্যার বিষয় নয়। কিন্তু যদি শিক্ষকের নিজেরই : কোন মানসিক সমস্যা থাকে?

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য এই কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শুধুমাত্র শেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করাই নয়, শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর মানসিক সমস্যাগুলিও কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা। আবার নিজের মানসিক স্বাস্থ্যও অটুট না থাকলে তার পক্ষে শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলির প্রকৃতি ও **প্রতিকার সম্বন্ধে ধারনা লাভ করা সম্ভব নয়।**

এই প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে সর্বশেষ এককটিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু ধারনা দেওয়া হল।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটি পাঠ শেষ হলে আপনি,

- মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- সংগতি বিধানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সংগতি বিধানের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অপসংগতির কারণগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অপসংগতির প্রতিকার সম্বন্ধে মতামত দিতে পারবেন।

৬.৩ মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারনা (Concept of Mental Health and Mental Hygiene)

সাধারনতঃস্বাস্থ্যবান মানুষ বলতে আমরা কী বুঝি? আপনি সম্ভবত বলবেন, রোগব্যাধিহীন মানুষ,

সুগঠিত সুপুষ্ট চেহারা ইত্যাদি। অর্থাৎ শরীরের কথাটাই আগে মনে আসবে। কিন্তু মনে করুন এমন একজন মানুষ যার শরীরে কোন রোগ নেই, চেহারাও ভালো কিন্তু তিনি তুচ্ছ কারণে রেগে গিয়ে যখন তখন একটা কান্ড ঘটান, কিংবা মনে মনে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন, এই বুঝি কোন বিপদ হল বা এরকম কিছু। আপনি কী তাকে সুস্থ মানুষ বলবেন?

এই কথা বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) স্বাস্থ্য কথাটির একটি সহজ অথচ সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছিল।

স্বাস্থ্য হল একটি সামগ্রিক স্বাচ্ছ্যন্দপূর্ণ অবস্থা, একটি ভালো থাকার অনুভূতি, শুধু রোগব্যাধির অনুপস্থিতি মাত্র নয়।

এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে –

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এই দুটিকে আলাদা করে নি। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য শরীর ভালো, মন ভালো নেই অথবা মন ভালো কিন্তু শরীর ভালো নেই, এর কোনটিই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। একটি খারাপ হলে অন্যটি খারাপ হবেই।
- স্বাস্থ্যের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবোধের একটা সম্পর্ক আছে। স্বাস্থ্যবান মানুষের মনে প্রচ্ছন্ন প্রফুল্লতাবোধ থাকার দরুন তিনি প্রকৃতই মনে করেন, আমি ভালো আছি।
- স্বাস্থ্য কোন চিরস্থায়ী অবস্থা নয়। নানা কারণে সাময়িকভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, আবার তা স্বাভাবিক হতে পারে।
- স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য পারিপার্শ্বিক কারণ যতটা দায়ী তার থেকেও বেশি দায়ী ব্যক্তির নিজের আভ্যন্তরীন অবস্থা।

এইসব বিচার করে বলা যায়, স্বাস্থ্য একটি ক্রমিক ধারনা, মানসূচক ধারনা **নয়। ক্রমিক ধারণা কথার** অর্থ খুব ভালো স্বাস্থ্য, ভালো স্বাস্থ্য, মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্য এইরকম ক্রমাগত স্বাস্থ্যর নিম্নমুখি একটি ধারা, আমরা চিন্তা করতে পারি। আর মানসূচক ধারনা হল, একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা বা মান পর্যন্ত একদল মানুষ স্বাস্থ্যবান ও অন্যরা স্বাস্থ্যহীন, এরকম হয় না। সমস্ত মানুষকে আমরা স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যহীন এই দুইভাগে ভাগ করতে পারি না, কিন্তু কম স্বাস্থ্য থেকে বেশিভালো স্বাস্থ্য এইভাবে ক্রমিক সারিবদ্ধ করতে পারি।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমাদের সুবিধার জন্য যদি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে আলাদাভাবে বিচার করি তাহলেও স্বাস্থ্যের বিষয়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই দিক থেকে মানসিক স্বাস্থ্য হল,

এমন একটি অবস্থা যা মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যা কিছু করণীয় তা স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করায় সাহায্য করে এবং তার আভ্যন্তরীন সংহতি বজায় রাখে।

অন্যদিকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হল, তাতে দেখা যাচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য সাময়িকভাবে হলেও বিঘ্নিত হতে পারে। সেইজন্য আমরা যেমন জানতে চাই মানসিক স্বাস্থ্য কী, তেমনি জানতে চাই মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার শর্তগুলি কী কী, কেন মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আবার কীভাবেই বা তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায়। এই সব বিষয়ে চর্চা করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা নামে মনোবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা তৈরি হয়েছে। এই বিদ্যা চর্চার মাধ্যমে মা-বাবা, শিক্ষক বা যে কোন মানুষই নিজের এবং তার চারপাশের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। নিজের ও অন্য মানুষের মানসিক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করতে পারেন।

সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ, স্বাস্থ্যহীনতার কারণ, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্বন্ধে চর্চা করে।

৬.৩.১ শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health of Teachers)

শিক্ষকও একজন ব্যক্তি। কাজেই তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য কোন স্বতন্ত্র বিষয় নয়। তবে শিক্ষক হিসাবে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য সরাসরি তার কর্তব্য কর্ম ও ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য **শিক্ষকদের** মানসিক স্বাস্থ্য আলাদাভাবে বিচার করা দরকার। কিন্তু তার আগে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ বা শর্তগুলি সম্বন্ধে একটু ধারনা লাভ করা প্রয়োজন। বাইরে থেকে একরকমভাবে মানুষের আচরণ ও তার ভাবনা চিন্তার গতি প্রকৃতি থেকে তার মানসিক স্বাস্থ্যের মাত্রা সম্বন্ধে বুঝতে পারি। কিন্তু মানুষের আচরণ ও ভাবনাচিন্তা অসংখ্য। সেজন্য কয়েকটি লক্ষণ মনোবিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করে সহজবোধ্যভাবে নিচের ছকটিতে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল।

লক্ষণ	স্বাস্থ্যবান মানুষ (উদাহরণ)	স্বাস্থ্যহীন মানুষ (উদাহরণ)
▪ নিজের সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারনা	একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, নিজেকে সেরকমই মনে করে।	একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজেকে অসাধারন বুদ্ধিমান মনে করে।

▪ চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারনা	অনুকূল পরিবেশকে অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিকূল মনে করে।	অনুকূল পরিবেশকেও প্রতিকূল মনে করে।
▪ মানুষে মানুষে সম্পর্ক	অন্য মানুষের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। সঙ্গত কারণে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে।	মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা নেই। অনিশ্চিত তুচ্ছ বা মনগড়া কারনেও সম্পর্ক নষ্ট হয়।
• প্রক্ষোভ জীবনে সংহতি	উপযুক্ত কারণে রাগ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি হয়। তার প্রকাশও সামাজিক মান অনুযায়ী হয়। প্রক্ষোভের প্রকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।	উপযুক্ত কারণ ছাড়াই রাগ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি হতে পারে। অনেক সময়ই তার প্রকাশ মাত্রা ছাড়া। কখন কীরকমভাবে প্রকাশ হবে তা অনিশ্চিত।
▪ উদ্বেগ	উদ্বেগের কারণ হলে উদ্বেগ হয়, কারণ দূর হলে উদ্বেগ চলে যায়।	অকারণে তীব্র উদ্বেগ বোধ। কারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন উদ্বেগ।
▪ মানসিক দ্বন্দ্ব	প্রয়োজনমত সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয় না।	**সীদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। সবক্ষেত্রেই দোলাচল মনোবৃত্তি**
▪ গূঢ়েষা (Complex)	প্রত্যক্ষ তথ্য দিয়ে সব কিছু বিচার করে। নিজেকে যা তাই মনে করে।	হীনমন্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ববোধের দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু বিচার করে (যেমন, আমি থাকতেও আমাকে যথেস্ট খাতির করা হল না)
▪ দৃঢ়মূল ভুল ধারনা	সেরকম কিছু থাকে না	অল্প মাত্রায় থাকতে পারে। (যেমন, খাবারের মধ্যে কিছু মিশিয়ে দেয় নি তো?)
▪ অর্থহীন চিন্তা, কাজ বারবার করা।	থাকে না।	থাকে। বারবার হাত ধোয়া, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির ভিত্তিতে আমরা শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিচার করতে পারি।

একজন শিক্ষক যদি মানসিক স্বাস্থ্যহীন হন তবে তাঁর আচরণ কেমন হতে পারে? একটি একটি করে বিচার করা যাক।

- **নিজের সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারনা** – শিক্ষক নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে অকারণে অন্ধ আত্মবিশ্বাস পোষণ করলে, তিনি নিজেকে কখনই সংশোধন করবেন না। শিখতে না পারলে ছাত্রদের দোষ।
- **চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারনা** – ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা আমাকে মানে না। এরকম ক্লাসে পড়ানো যায় না। পড়ানোর চেয়ে শাসন করেন বেশি।
- **মানুষে মানুষে সম্পর্ক** – সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের সজ্গে খারাপ সম্পর্ক।
- **প্রক্ষোভ জীবনে সংহতি** – ক্লাসে হঠাৎ হঠাৎ প্রচন্ড রেগে যান। মাত্রাহীনভাবে মারধোর করেন। ছাত্রছাত্রীরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। আড়ালে নিন্দা করে।
- **উদ্বেগ** – যদি চাকরি না থাকে বা এরকম নানা অশান্তি নিজের কাজে মন বসতে দেয় না। শিক্ষণ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **মানসিক দ্বন্দ্ব** – ক্লাসের মধ্যে কখন কী করতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।
- **গুঢ়ৈষা** – ছাত্রছাত্রীরা, সহকর্মীরা আমাকে আড়ালে উপহাস করে কারণ আমি অঙ্ক শেখাই না, বাংলা পড়াই।
- **দৃঢ়মূল ভুল ধারনা** – সহকর্মীরা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই প্রধান শিক্ষকের কাছে আমার নামে নালিশ করে।
- **অর্থহীন চিন্তা, কাজ বার বার করা** – কথা বলায় মুদ্রাদোষ, অকারণে বার বার ব্ল্যাকবোর্ড, টেবিল মোছা ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীরা আড়ালে হাসাহাসি করে।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে একজন মানসিক স্বাস্থ্যহীন শিক্ষকের আচরণ ও তার প্রভাব সম্বন্ধে একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এমন নয় এর সব কয়টি লক্ষণই উপস্থিত থাকে। একটি বা দুটি লক্ষণ থাকলেও তা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতাকেই প্রমাণ করে। সুতরাং একজন শিক্ষকের নিজের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মানসিক স্বাস্থ্যহীন শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তার অধিকাংশই সহজে নিরাময় হতে পারে। তার জন্য প্রাথমিকভাবে দুটি পদক্ষেপই যথেষ্ট।

প্রথম, প্রত্যেক শিক্ষকই নিজের আচরণ সম্বন্ধে সজাগ থাকুন। নিজের মেজাজ, প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা আলোচনার প্রসঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়, নিজের আচরণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে অন্য কোন অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করুন, পরামর্শ নিন। যাদের গুরুতর সমস্যা আছে তাঁরা মনোবিজ্ঞানী বা অন্য কোন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার (Counsellor) পরামর্শ নিন। মনে রাখতে হবে শেষপর্যন্ত সমস্যা নিজেই কাটিয়ে ওঠা যায়।

শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়ার বিশেষ কোন স্বতন্ত্র কারণ নেই। সুতরাং কারণগুলি একসঙ্গে পরবর্তী একটি অংশে উল্লেখ করা হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ১ (Check Your Progress – 1)

নির্দেশ : ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিন।

২) মানুষে মানুষে সম্পর্ক দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিচার করা যায় কীভাবে?

৩) দৃঢ়মূল ভুল ধারণা কাকে বলে?

৪) অর্থহীন কাজ বার বার করার একটি উদাহরণ দিন (ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে)।

৫) মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার উদ্দেশ্য কী?

৬.৩.২ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health of the Learners)

মানসিক স্বাস্থ্যের মূল শর্তগুলি, যা শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, সব মানুষের বেলাতেই এক। কিন্তু যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের বিকাশ পর্ব তখনও উত্তর শৈশব পর্যায়ে, সেহেতু তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বড়দের দৃষ্টিতে দেখা চলবে না। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার যেসব লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে, তার কয়েকটি এখানে লেখা হল।

- **প্রক্ষোভ** – নিয়ন্ত্রণহীন রাগ, অযৌক্তিক ভয় এবং অতিরিক্ত উদ্বেগ এইগুলি অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায়। রাগের আকস্মিক বিস্ফোরণ, আক্রমণ করার প্রবণতা, অকারণে কোন সাধারন বা তুচ্ছ জিনিসকে ভয় করা,ব্যর্থতার ভয়, পড়া না বলতে পারার ভয়, এগুলি খুব সাধারণ ঘটনা।
- **নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনা** – ছোটবেলা থেকে মা-বাবার কাছে শুনেছে তার অসাধারণ বুদ্ধি। এর ফলে কোন কোন শিক্ষার্থী সত্যিই বিশ্বাস করে তার বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষকরা বা অন্য ছাত্ররা যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছে না। শিক্ষকরা তার প্রতি অকারণে অবিচার করছে।
- **ঈর্ষা পরায়নতা** – অন্যের সাফল্যে বা অন্য কারও সম্পদ নিজের না থাকার দরুণ যে অনুভূতি তার একটি বৈশিষ্ট্য হল, অন্যেরটাকে ছোট করে দেখা। এই অনুভূতিটাই ঈর্ষা। প্রাথমিকস্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঈর্ষা পরায়নতা খুবই সাধারণ ঘটনা।

▪ **আত্মকেন্দ্রিকতা** – নিজেকে সব কিছুর মধ্যমণি চিন্তা করে, চারপাশের জগৎকে বিচার করার নাম আত্মকেন্দ্রিকতা। আত্মকেন্দ্রিক ছেলেমেয়েরা নিজেকে বাদ দিয়ে কোন কিছু ভাবতে পারে না। অন্যের চাহিদা, সুখ সুবিধা, ভালোমন্দ তাদের কাছে গৌণ ব্যাপার। এদের সামাজিক অভিযোজন কম এবং সহপাঠীদের সঙ্গো সম্পর্ক খারাপ।

▪ **অন্তর্মুখিতা** – এরা বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিজের মনগড়া জগতে বিচরণ করে। বাইরের সবকিছু সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় এদের বিকাশ পর্ব **ব্যাহত** হয়। অতিরিক্ত কল্পনা বিলাসী হওয়ার জন্য এদের সাফল্যের জন্য উদ্যম ও চেষ্টা কম। বাস্তব জগতের আনন্দ দুঃখ এসব এদের কাছে মূল্যহীন।

▪ **বিষন্নতা** – কিছু কিছু ছেলেমেয়ে সদা বিষন্ন। তারা কোন কিছুতেই উৎসাহ বোধ করে না। সবকিছুই তাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। এমনকি খেলাধূলাতেও তাদের উৎসাহ নেই। এদের শিক্ষাও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এরা শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহ বোধ করে না। কিছুই ভালো না লাগায় মনোযোগ দেওয়া হয় না।

▪ **ধ্বংসাত্মক আচরণ** – সব কিছু ভেঙ্গে নষ্ট করে বা তছনছ করে,দেওয়ার প্রবণতার নাম ধ্বংসাত্মক আচরণ। এরা মাঝে মাঝেই ক্লাসের পঠনপাঠনে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আসবাবপত্রে খোদাই করা, কাটা, ভাঙ্গা, ছেঁড়া খুব সাধারণ ঘটনা।

▪ **খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যা** – খাদ্যগ্রহণে অনীহা অথবা অতিরিক্ত বেশি খাওয়া, কিংবা যা খাদ্য নয়, এমন জিনিস (যেমন, চক, মাটি, পেন্সিল, নখ ইত্যাদি) খাওয়া, নখ কামড়ানো মানসিক **স্বাস্থ্যহীনতার** লক্ষণ।

▪ **পলায়নী মনোভাব** – বাড়ি থেকে বা স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও খুব বিরল নয়। তবে সমস্ত পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাই মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গো যুক্ত নয়। কৌতুহলবশত বা কোন দুঃসাহসিক অভিযানের মোহে, কোন কাল্পনিক আকাঙ্খা পূরণের জন্য অনেকসময় ছেলেমেয়েরা একা অথবা দল বেঁধে বাড়ি বা স্কুল থেকে পালায়। যখন, অন্য কোন সঙ্গাত কারণ ছাড়াই একা **কোন** ছেলে বা মেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পালিয়ে যায় এবং তা বারবার ঘটাতে থাকে তখন সেটিকে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

▪ **মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা** – মিথ্যা কথা বলার সব ঘটনাই মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ নয়। নানা কারণেই মানুষ মিথ্যা কথা বলে। ছেলেমেয়েরা শাস্তি এড়ানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে। কিন্তু অকারণে মিথ্যা কথা বলা যখন প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয় এবং মিথ্যা কথা যখন অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটি মানসিক **স্বাস্থ্য**হীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

- **নিপীড়নের প্রবণতা** – অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়ার প্রবণতা কিছু কিছু শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। পশুপাখি, সহপাঠী বা অন্য ছোটো ছেলেমেয়েদের উৎপীড়ন করে এরা আনন্দ পায়। মাঝে মাঝে এই জাতীয় আচরণ যথেষ্ট নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার এইসব লক্ষণ ছাড়া আরও অন্যান্য **যেসব** আচরণ আছে তার সব কয়টি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ হয় সেগুলি প্রাথমিকস্তরে ততটা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে না, নাহলে স্কুলের ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রভাব নেই। কিন্তু যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হল তার প্রায় সবকয়টিই কোনও না কোনভাবে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন বিঘ্নিত করে।

৬.৪ সংগতিবিধান (Adjustment)

মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় আভ্যন্তরীন সংহতি নামে একটি কথা বলা হয়েছিল। আভ্যন্তরীন সংহতি কথাটি সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তারিতভাবে এখন জানা দরকার। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যা কিছু প্রয়োজন হয় তার মধ্যে কিছু কিছু আছে যেগুলি প্রাণধারনের জন্য একান্ত আবশ্যিক। খাদ্য, জল, বাসস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য আমাদের আছে স্বাভাবিক চাহিদা। এই সব চাহিদা পূরণ হলে তারপর সামজিক ও অন্যান্য চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমরা যা যা চাই তার সামান্য অংশই পাওয়া যায়। অর্থাৎ চাহিদা কখনই পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনধারনের কোন সমস্যা হয় না। কোন কিছু চাহিদামত না পেলে, বিকল্প জিনিস নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। এমনকি একেবারে না পেলেও তার জন্য যে হতাশা সেটা কাটিয়ে উঠতে সমস্যা হয় না।

এই যে প্রতিনিয়ত চাহিদা না পূরণ হওয়ার অতৃপ্তি আর সেই অতৃপ্তিকে কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার চেষ্টা এটা সম্ভব হয় কারণ আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের আচরণের সামঞ্জস্যবিধান করে বাঁচতে চাই। এই প্রক্রিয়ার নাম সংগতিবিধান। তা হলে প্রথমেই এর একটি সংজ্ঞা স্থির করে নেওয়া দরকার।

৬.৪.১ সংগতিবিধানের সংজ্ঞা (Defination of Adjustment)

সংগতিবিধানের তিনরকম সংজ্ঞা হতে পারে। তার প্রথমটি অভিযোজনভিত্তিক সংজ্ঞা।

- **অভিযোজন** (adaptation) কথার অর্থ নিজেকে পরিবেশের দাবি অনুযায়ী পরিবর্তন করে নেওয়া। ডারউইনের বিবর্তনবাদে একটি প্রসঙ্গ ছিল, যে প্রাণি পরিবেশের সঙ্গে যত ভালো অভিযোজন করে চলতে পারে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে বেশি। কিন্তু যে প্রাণি তা পারে না তার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাওয়ার **সম্ভাবনা** । আমরা প্রচলিত কথায় একে বলি **পরিস্থিতির** সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গী সংগতিবিধানের সংজ্ঞা হল –

পরিস্থিতির বা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সংগতিবিধান।

কিন্তু মানুষ যে সবসময় পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পন করে এমন নয়। সে পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন আনতেও চেষ্টা করে। খাদ্য কম থাকলে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকার অভ্যাস করার **নাম** সংগতি বিধান। অথবা অন্য সকলেই যেহেতু আপনার বিপরীত মত পোষণ করে, সেহেতু শেষ পর্যন্ত তাদের মতটাকেই গ্রহণ করার নামও সংগতিবিধান। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি আরও খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপাদন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন, অথবা সাময়িকভাবে মেনে নিলেও, নানাভাবে চেষ্টা করে যান অন্যদের মত পরিবর্তন করতে। সুতরাং অভিযোজনভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়ে সংগতিবিধানের অর্থ আংশিক প্রকাশ পায় মাত্র।

সংগতিবিধানের আর একটি সংজ্ঞা হল আভ্যন্তরিণ সংহতিভিত্তিক। আভ্যন্তরীন সংহতির আর এক নাম **ব্যক্তিত্বের সংহতি** (Integration of Personality)। ব্যক্তিহিসাবে আমাদের বুদ্ধি, যুক্তি, প্রক্ষোভ ইত্যাদি যা কিছু উপাদান সেগুলির সমন্বয়ে **আচরণকে** নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের মধ্যে যদি সংহতি বা ভারসাম্য না থাকে তবে আমাদের আচরণ **অসামঞ্জস্যপূর্ণ** হয়ে পড়ে। প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলির মধ্যে একধরনের ভারসাম্য থাকে যা তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি স্থির করে দেয় কোন ছাত্র কোন অন্যায় আচরণ করলে একজন শিক্ষক প্রচন্ড রেগে গিয়ে এমন মারলেন যে সে আহত হয়ে গেল, অন্য একজন শিক্ষক তাকে মুখে তিরস্কার করলেন, আরও একজন শিক্ষক একই অপরাধে তাকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন তার আচরণটি কেন অন্যায় এবং তাকে সংশোধনের সুযোগ দিলেন। এই তিন **জন** শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের সংহতি তিনরকম। প্রথম জনের বেলায় সংহতির মান খুব কম, দ্বিতীয় জনের সংহতির মান কিছুটা বেশি এবং তৃতীয় শিক্ষক সবচেয়ে ভালো সংগতি বিধান করতে পারেন কারণ তার ব্যক্তিত্বের সংহতি খুবই ভালো। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সংগতিবিধানের সংজ্ঞা নিম্নরূপ –

সংগতিবিধান মানুষের আভ্যন্তরীন তথা ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলির মধ্যেকার সাম্য ও সংহতি যা তার আচরণকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সংগতিবিধান একটি **স্থায়ী** অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষের আচরণ সংহতিপূর্ণ ও সুষম হয়ে থাকে। যার মধ্যে এই সংহতি আছে তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গো মানিয়ে চলা সহজ, যার নেই সে পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজন করতে পারেনা।

তৃতীয় সংজ্ঞাটি এই দুটির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে –

আভ্যন্তরীন সংহতির প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংগতিবিবধান।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত এই সব সংজ্ঞা থেকে করা যায়.

- যার সংগতিবিধান ক্ষমতা যত বেশি তার মানসিক স্বাস্থ্য তত ভালো।
- সংহতি থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবেশ অতিরিক্ত রকমের প্রতিকূল হয়, তবে সাময়িকভাবে সংহতি এবং সেই জন্য মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে।
- পীড়নের (stress) সহনশীলতার সঙ্গো মানসিক **স্বাস্থ্য** ও সংগতিবিধানের সম্পর্ক আছে। যার সংগতি বিধান যত ভালো তার সহনশীলতা বেশি, যাদের কম তার অল্পতেই ভেঙে পড়ে।
- ব্যক্তিত্বের সংহতি হঠৎ করে তৈরি হয়না ।
- ছোটোবেলা থেকে মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে সংহতির বিকাশ হয়।
- যাদের ব্যক্তিত্বের সংহতি দৃঢ় তারা অতিরিক্ত প্রতিকূল অবস্থায় ভেঙে পড়লেও আবার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। যাদের সংহতি দুর্বল তারা একবার ভেঙো পড়লে আবার মানসিক স্বাস্থ্য সহজে পুনরুদ্ধার করতে পারে না।
- প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের সংহতি তখনও বিকাশের পর্যায়ে থাকে, পূর্ণাঙ্গারূপ পায় কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে **পৌছানোর** পর। সেজন্য সংগতি বিধানের সহায়ক হিসাবে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ২ (Check Your Progress – 2)

নির্দেশ ঃ ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) মানসিক স্বাস্থ্যহীন শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ জনিত কী কী সমস্যা দেখা যায়?

২) আত্মকেন্দ্রিকতা কী?

৩) সঙ্গাতিবিধানের সংজ্ঞা দিন।

৪) ব্যক্তিত্বের সংহতি কাকে বলে?

৫) নিপীড়ন প্রবণ শিশু কারা?

৬.৪.২ সংগতিবিধানের কৌশল (Mechanism of Adjustment)

মানসিকভাবে সংগতিবিধান করার প্রক্রিয়াটি জটিল। কারণ যান্ত্রিকভাবে সংগতিবিধান হয়না। নিজের অজ্ঞাতে হলেও বিশেষ বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে মানুষ তার চাহিদা পূরণ না হওয়ার দরুণ যে পীড়ন (stress) তাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই বিষয়টি নানারকম তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে

মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীগুলি বাদ দিয়ে একজন প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কী কী কৌশল অবলম্বন করে সংগতিবিধান করতে পারেন সেগুলি উল্লেখ করা হল।

বিকল্প চাহিদা – যে চাহিদা পূরণ হয় নি বা হওয়া সম্ভব নয়, তার পরিবর্তে অন্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে সেইটি অর্জন করার চেষ্টা করলে সংগতিবিধান সহজ হবে। যেমন, লেখাপড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করা যায় নি, হাতের কাজে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করা।

উদ্‌গতি – আক্রমন করার প্রবণতা, ধ্বংস করার প্রবণতা, অপরকে নির্যাতন করে আনন্দ পাওয়া, মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, এই সবগুলি মানসিক **স্বাস্থ্যহীনতার** লক্ষণ এবং বলা বাহুল্য দুর্বল সংগতিবিধানই এর কারণ। এইগুলি কাটিয়ে ওঠার ভালো উপায়, সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে এই প্রবণতাগুলি চরিতার্থ করা। যেমন, ছবি আঁকা, কাঠ-মাটি ইত্যাদি দিয়ে কিছু তৈরি করা, গল্প লেখা বা এরকম যেকোন কাজ।

আলোচনা – নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনা থাকলে, মা-বাবা, শিক্ষক বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য মানুষের সঙ্গে তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা। বিশেষভাবে মানসিক পীড়ন কাটিয়ে ওঠার এটি একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

নিজেকে ব্যস্ত রাখা – বার বার নানা অবাঞ্ছিত কাজ করা ইচ্ছা বা অবাঞ্ছিত চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিজেকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলে ইচ্ছা প্রশমিত হতে পারে।

যুক্তি প্রদান – ছোটো **ছোটো**ছেলেমেয়েরা প্রায়ই কোন অন্যায় কাজ করলে মনে করে আমি একা করিনি আরও কেউ অন্যায় করেছে (শুধু আমি ভাঙ্গিনি, রামও ভেঙ্গেছে) এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে সে যে সান্ত্বনা পায় তাতে সে কিছুটা অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু এইভাবে সংগতিবিধান করা বাঞ্ছিত নয়। যুক্তিপ্রদান করে সংগতিবিধানের সবচেয়ে ভালো উপায় নিজের সাফল্য ব্যর্থতা বা অন্যায় আচরণের পর্যালোচনা করার চেষ্টা করলে সংগতিবিধান সহজ হয়।

একাত্মতা ও প্রতিফলন – প্রকৃত প্রতিফলন কথাটির অর্থ নিজের অবাঞ্ছিত চিন্তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া। এখানে কথাটি একটু ভিন্ন অর্থে সংগতিবিধানের কৌশল হিসাবে দেওয়া হল। যখন নিজের চাহিদা পূরণ না হলেও, যার চাহিদা পূরণ হয়েছে তার সন্তোষে আমরা সন্তুষ্ট বা আনন্দিতবোধ করি তখন তাকে বলা হয় একাত্মতা। কিন্তু নিজের ব্যর্থতার অথবা অবাঞ্ছিত আচরণের দায় কিছুটা অন্যের উপর দিয়ে যে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় **প্রতিফলন**। যেমন, আমাকে আগে ধাক্কা দিয়েছে সেই জন্য আমি মেরেছি।

ভাগ্যবাদী সংগতিবিধান – যুক্তি বা বিশ্লেষণের সাহায্যে বিচার না করে কিছু কিছু মানুষ, যা হওয়ার তাই হবে এই জাতীয় মনোভাব নিয়ে নিশ্চিত হয়ে অন্যায় আচরণ করে। ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তারা সাময়িকভাবে অন্যায় কাজ করার দরুন যে মানসিক পীড়ন তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু এই ধরনের সংগতিবিধান নিজের স্বস্তির কারণ হলেও অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং এতে ব্যক্তির আচরণের সংশোধন হয় না।

অন্তর্দৃষ্টি – সংগতিবিধানের একটি প্রকৃষ্ট উপায় নিজের চিন্তাভাবনা ও আচরণ সম্বন্ধে নিজেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তার সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা। বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে সজাগ রেখে সংগতিবিধান করার চেষ্টা মানুষকে প্রকৃতই মানুষ করে তোলে।

আদর্শ অনুকরণ – নিজের প্রক্ষোভ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার আর একটি উপায় কোন আদর্শব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করা। এই আদর্শব্যক্তি কোন মহাপুরুষ বা দুরের কেউ না, চারপাশের মানুষের মধ্যে এমন আদর্শের দেখা পাওয়া যায়। সচেতনভাবে তাকে লক্ষ করে তার মত আচরণ করতে করতে মানুষের সংগতিবিধান প্রক্রিয়া উন্নত হয়।

৬.৫ অপসংগতি (Maladjustment)

অপসংগতি সংগতিবিধানের বিপরীত। অর্থাৎ সংগতিবিধানের অভাব বা দুর্বলতা থাকলে তাকে বলা হয় অপসংগতি। সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্য হাত ধরাধরি করে চলে। অর্থাৎ যাদের অপসংগতি আছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যও দুর্বল। মানসিক **স্বাস্থ্যহীনতায়** যেসব লক্ষণ **সেগুলি অপসংগতির।** লক্ষণ। সুতরাং আলাদা করে অপসংগতির লক্ষণ বিচার না করে বরং দেখা দরকার অপসংগতি কেন হয়।

৬.৫.১ অপসংগতির কারণ (Causes of Maladjustment)

আগেই আপনারা জেনেছেন যে আকস্মিভাবে অপসংগতি বা সংগতিবিধানের প্রকৃতি মানুষ অর্জন করে না। ছোটবেলা থেকে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একটি শিশু বড় হয় তারই উপর নির্ভর করে তার সংগতিবিধান কতটা দৃঢ় বা দুর্বল হবে। সুতরাং অপসংগতির একটিমাত্র কারণ নয়, একাধিক কারণ থাকতে পারে।

- **জৈবিক কারণ** – খুব অল্প কিছু মানুষের ক্ষেত্রে জিনগত ত্রুটি বা বংশগতির জন্য অপসংগতি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এরকম অপসংগতির আগাম পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণ করাও যায় না।

- **দৈহিক গঠন** – দৈহিক গঠনের সঙ্গে সামাজিক অভিযোজনের কিছুটা সম্পর্ক আছে। যাদের উচ্চতার তুলনায় দেহের ওজন ছোটবেলা থেকেই অতিরিক্ত বেশি তাদের সামাজিক অভিযোজন বাধা পায়। সেই কারণে তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপসংগতি দেখা দিতে পারে।
- **শারীরিক প্রতিবন্ধকতা** – যাদের অস্থির বিকলাঙ্গতা, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা আছে যদি ছোটবেলা থেকেই তারা যথাযথ সহায়তা না পায়, তবে তাদের সংগতিবিধান ব্যাহত হতে পারে। এই কারণে মানসিক প্রতিবন্ধী ও বধির ছেলেমেয়েদের কারও কারও মধ্যে অপসংগতি (প্রধানত প্রক্ষোভ সম্পর্কিত) দেখা যায়।
- **শিশুপালন** – ছোটবেলা থেকে একটি শিশুকে লালন পালন করা পিতামাতার দায়িত্ব। কিন্তু সমস্ত মা বাবার সন্তান পালনের রীতি একরকম নয়। কেউ কেউ অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেন, কেউ বা শাসনের নামে দমন ও নিপীড়নের পক্ষপাতী আবার কোন কোন মা-বাবা সন্তানের স্বভাব প্রকৃতি ও চাহিদা বুঝে নিয়ে যুক্তি সংগতভাবে শাসন ও ভালোবাসার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন। তৃতীয়ধরনের পিতামাতার সন্তানদের সংগতিবিধান সবচেয়ে ভালো হয়। বাকি দুইধরনের ক্ষেত্রে অপসংগতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

  এছাড়াও, সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে মা-বাবার প্রবল মতবিরোধ, অবহেলা, নির্যাতন, উদাসীনতা এইসব সংগতিবিবধানের প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। মা-বাবার বিচ্ছেদ, বিশেষত মায়ের মৃত্যু সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।
- **পিতামাতার প্রত্যাশা** – সন্তানের ক্ষমতার বিচার না করে মা-বাবারা তাদের কাছে এমন প্রত্যাশ্য করে থাকেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন যা তাদের অপসংগতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রাথমিকস্তরে ছোটদের অপসংগতির জন্য বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের ভূমিকাও কম নয়।
- **শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য** – মানসিক স্বাস্থ্যহীন শিক্ষকের অসংগত ও বিশৃঙ্খল আচরণ শিশুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাদের কাছে শিক্ষক একজন আদর্শ অনুকরণীয় ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর আচরণ তাদের প্রত্যাশার বিপরীত হলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়, শিক্ষার্থীদের অপসংগতির সৃষ্টি হয়।
- **শাস্তি ও শৃঙ্খলা** – বিদ্যালয়ে নিপীড়নমূলক শাস্তি ও যুক্তিহীন শৃঙ্খলারক্ষার চেস্টা করলে ছাত্রছাত্রীদের

  কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। ক্রমশ তারা বিষন্নতা ও বিপন্নতার শিকার হয়। শাস্তির কারণ তাদের কাছে স্পস্ট হওয়া দরকার এবং লঘু **অপরাধে** গুরু শাস্তি বা তার বিপরীত অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- **অবিচার** – শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ কিছু কিছু শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাতমূলক অবিচার শিশুদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়।

- **ক্রমাগত ব্যর্থতা** – যদি শিক্ষার্থীর সক্ষমতা না বুঝে তার জন্য এমন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় যা তার পক্ষে অসম্ভব, যদি তাকে ক্রমাগত ব্যর্থতার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়, তবে আস্তে আস্তে হতাশা তাদের গ্রাস করে। তারা আর সাফল্যের জন্য চেষ্টা করে না। শুধু তাই নয় কখনও বিষন্নতাবোধ কখন সমস্ত কিছুর প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ও ধ্বংসাত্মক চিন্তা তাদের স্বাভাবিক সংগতিবিধান প্রক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয়। তারা অপসংগতির শিকার হয়।
- **সহপাঠীদের আচরণ** – ব্যর্থতার জন্য অথবা অন্য কোন ত্রুটি বা দুর্বলতার দরুণ সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, নিপীড়ন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এগুলি অপসংগতির কারণ হতে পারে।

এসব ছাড়াও, সামজিক বঞ্চনা, দারিদ্র, খারাপ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপসংগতির কারণ হতে পারে। শিক্ষকদের অপসংগতি নতুন করে বিচার করার কোন কারণ নেই। অর্থাৎ তাঁদের অনেকে অপসংগতি নিয়েই শিক্ষকতায় আসেন। তবে অতিরিক্ত চাপ ও বঞ্চনা কখনও কখনও তাদের সংগতি সাধনে বাধা দিতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন – ৩ (Check Your Progress – 3)

নির্দেশ ঃ ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১) উদ্‌গতি কীভাবে সংগতিবিধানে সাহায্য করে?

২) ভাগ্যবাদী সংগতিবিধান ক্ষতিকর কেন?

৩) শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কী?

৪) কীধরনের শিশুপালন অপসংগতির কারণ হতে পারে?

____
____
____

৫) আপনারদেখা অপসংগতি সম্পন্ন একজন মানুষের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

____
(ক) ____
(খ) ____
____

৬.৫.২ অপসংগতির প্রতিকার (Remedial Measures of Maladjustment)

অপসংগতির কারণগুলির মধ্যেই তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিষয়টি নিহিত আছে।

- **পিতামাতাকে পরামর্শদান (Parental Counselling)**

  যদি দেখা যায় পারিবারিক কারণে কোন শিক্ষার্থী সংগতিবিধান বাধা পাচ্ছে এবং অপসংগতি দেখা দিচ্ছে তবে শিক্ষকের পক্ষে সরাসরি তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে মা-বাবাকে এক সঙ্গো ডেকে তাদের সঙ্গো সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে উপযুক্ত পরমার্শ দিলে কাজ হতে পারে। তবে পরামর্শ অর্থে কোন উপদেশ দান নয়। সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করে, মা-বাবারা যাতে দুর্বলতাগুলি বুঝতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা এবং যৌথভাবে শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলি দূর করার চেস্টা করা। অনেকসময় ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় মা-বাবাকে সরাসরি যুক্ত করতে পারলে ভালো কাজ দেয়।

- **সক্রিয়তা ও সহপাঠক্রমিক কাজ**

  অপসংগতি যাদের আছে সেইসব ছেলেমেয়েকে আরও বেশি করে সক্রিয় রাখুন। নানারকম সহপাঠক্রমিক আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংগতিবিধান করতে সাহায্য করুন। এককভাবে উদ্‌গতিমূলক কাজ যেমন সংগতিবিধানে সাহায্য করে তেমনি দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ স্বচ্ছন্দভাবে হতে পারে।

- **অন্তর্দৃষ্টি**

  নিজের ক্ষমতা ও দুর্বলতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং নিজের আচরণ সম্বন্ধে তারা যাতে বিচার করে দেখতে শেখে প্রথম থেকেই তাঁদের সেইভাবে শিক্ষা দিন। এর ফলে তাদের সহনশীলতা বাড়বে।

- **বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা**

  শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নিয়ম নীতিগুলির কারণ ব্যাখ্যা করুন। নিয়মগুলি যেন স্পষ্ট ও সহজ হয় এবং তা যেন সকলের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।

- **সাফল্য ও ব্যর্থতা**

  দুর্বল বা ভালো ছাত্র যাই হোক না কেন প্রত্যেককে সাফল্যের স্বাদ পেতে দিন। সাফল্যের মত ব্যর্থতাও আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। ক্রমাগত সাফল্য মানুষের ব্যর্থতার মোকাবিলা করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের সহজ ও কঠিন দুরকম সমস্যারই মুখোমুখি হতে দিন। তারা যেন ব্যর্থতা ও সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে শেখে এবং ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে শেখে।

- **সুবিচার**

  সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে সমদৃষ্টিতে দেখুন। পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকুন। নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। তারা যেন আপনাকে আদর্শ ও অনুকরণীয় মনে করে।

- **পরামর্শদান ও আচরণ পরিবর্তন**

  খুব বেশি অপসংগতিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ পরামর্শদান (counselling) ও তাদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য স্কিনারের পদ্ধতিতে উপযুক্ত প্রবলন প্রক্রিয়া খুব কার্যকর।

তবে এইসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগ করার জন্য অপসংগতির ধরন সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার এবং সঠিক কারণ নির্ণয় করাও দরকার। অনেক সময়ই প্রকৃত **প্রতিকারমূলক** ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত।

৬.৬ সার সংক্ষেপ (Let us Sum up)

স্বাস্থ্য একটি সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থা একটি ভালো থাকার অনুভূতি। শুধুমাত্র রোগব্যাধির অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্য একটি ক্রমিক ধারনা অর্থাৎ স্বাস্থ্য ক্রমাগত আরও ভালো বা আরও খারাপ হতে পারে। মানুষকে স্বাস্থ্যহীন ও স্বাস্থ্যবান এরকম দুইভাগে **ভাগ** করা যায় না। অন্যদিকে যে বিজ্ঞান মানসিক স্বাস্থ্যের প্রকৃতি। স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চর্চা করে তাকে বলা হয় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা।

একজন ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে, আবার তার পুনরুদ্ধারও

হতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করে সেজন্য মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষকের সচেতন হওয়া দরকার। কয়েকটি লক্ষণ দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতাকে বোঝা যায়। এইসব লক্ষণ হল, নিজের সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারনা, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারনা, মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক প্রক্ষোভ জীবনে সংহতি, উদ্বেগহীনতা, মানসিক দ্বন্দ্বহীনতা ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কিছু আচরণের মধ্যে দিয়ে এরকম আরও কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিলে তাদের প্রক্ষো**ভের** অপসংগতি, নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনা, ঈর্ষাপরায়ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তর্মুখিতা, বিষন্নতা, ধ্বংসাত্মক আচরণ, খাদ্য ও নিদ্রা সংক্রান্ত সমস্যা, পলায়নী মনোভাব, মিথ্যা কথা বলা, নিপীড়নের প্রবণতা ইত্যাদি দেখা যায়।

সংগতিবিধান কথাটির অর্থ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন বা আভ্যন্তরীন ব্যক্তিত্বের সংহতি। সংগতিবিধানের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সেজন্য মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি সংগতিবিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিকল্প চাহিদা, উদ্‌গতি,আলোচনা, নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যুক্তি প্রদান, একাত্মতা ও প্রতিফলন, ভাগ্যবাদী সংগতিবিধান, অন্তর্দৃষ্টি, আদর্শ অনুকরণ, এইগুলি প্রাথমিকস্তরে সংগতিবিধানের কৌশল।

৬.৭ অনুশীলনী (Unit end Exercises)

১) নিচের প্রশ্নগুলির দুই একটি বাক্যে উত্তর দিন। (অনধিক ৬০টি শব্দে)

(ক) স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা কী ?

(খ) মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে?

(গ) স্বাস্থ্যকে ক্রমিক ধারনা কেন বলে?

(ঘ) প্রক্ষোভ জীবনে সংহতি কথাটির অর্থ কী?

(ঙ) মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে কেন?

(চ) গুঢ়ৈষা কাকে বলে?

(ছ) ঈর্ষাপরায়ণতা কাকে বলে?

(জ) শিক্ষার্থীদের বিষন্নতা থাকলে কী হয়?

(ঝ) নিপীড়নের প্রবণতা কী?

(ঞ) পীড়ন সহনশীলতা কী?

(ট) উদ্‌গতি কাকে বলে?

(ঠ) পিতামাতার প্রত্যাশা অপসংগতি সৃষ্টি করে কেন?

(ঢ) অপসংগতি কাকে বলে?

(ণ) পরামর্শদান কাকে বলে?

২) নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (অনধিক ১৫০টি শব্দে)

(ক) স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন?

(খ) মানসিক স্বাস্থ্যের যে কোন পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখ করুন।

(গ) শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বল হলে তাদের আচরণ**কেমন** হয়? উদাহরণ দিন।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বল হলে তাদের আচরণ কেমন হয় তার পাঁচটি উদাহরণ দিন।

(ঙ) অপসংগতির পাঁচটি কারণ উল্লেখ করুন।

(চ) অপসংগতির প্রতিকার কীভাবে সম্ভব? যেকোন তিনটির আলোচনা করুন।

৩) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (অনধিক ২৫০ টি শব্দে)

(ক) মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আচরণ আলোচনা করুন।

(খ) সংগতিবিধান কাকে বলে? সংগতিবিধানের কৌশলগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(গ) অপসংগতি কাকে বলে? অপসংগতির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৬.৮ উত্তর সংকেত (Hints to Answer)

অগ্রগতি যাচাই – ১

মানসিক স্বাস্থ্য এমন একটি অবস্থা যা মানুষকে তার. দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যা কিছু করণীয় তা স্বচ্ছন্দে করতে সাহায্য করে এবং তার আভ্যন্তরীন সংহতি বজায় রাখে (**২**.৩ অংশ)

একক - ৭

সংগঠন (Structure)

৭.১ : সূচনা

৭.২ : উদ্দেশ্য

৭.৩ : যোগাযোগ

৭.৪ : শিশুর কথা শেখা

৭.৫ : শিশুর আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কথা বলার ক্ষমতা

৭.৬ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৭.৭ : প্রথাগত শিক্ষাস্তরে যোগাযোগের আদান-প্রদান

৭.৮ : সারসংক্ষেপ

৭.৯ : অনুশীলনী

৭.১০ : উত্তর সংকেত

একক - ৭

যোগাযোগ ও শিশুর যোগাযোগ প্রক্রিয়া
(Communication and children's communicative Process)

৭.১ সূচনা (Introduction) ঃ

যোগাযোগ বা Communication হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয়। শ্রেণি কক্ষে এই যোগাযোগ স্থাপন হয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে। শিক্ষক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যমে শিশু বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। শিশুর আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে যোগযোগের ক্ষমতা রয়েছে। আর ভাষা হল সেই যোগাযোগের মাধ্যম। যা শিশুর মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে শুধু তাই নয়,— চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশেও সহায়তা করে। তাই এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যোগাযোগ দক্ষতার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সম্পর্কে জানতে পারব এবং শিশু কীভাবে যোগাযোগ করে তা বুঝতে পারব।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- যোগাযোগের উপাদান ও দক্ষতা সম্পর্কে জানাতে পারবেন।
- শিশু কীভাবে কথা শেখে সে সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।
- প্রাক-ভাষা শিক্ষার পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিকাশের ধারা অনুযায়ী বয়স উপযোগী শিখন, ভাষা বিকাশের কার্যাবলী, ভাষা বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি হবেন।
- শিশুর আদান-প্রদানের মাধ্যমে হিসাবে অপ্রথাগতভাবে ও প্রথাগতভাবে কথা বলার ক্ষমতার শিখন প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.৩ যোগাযোগ বা (Communication) ঃ

যোগাযোগ বা Communication কথাটি ল্যাটিন শব্দ Communicare থেকে এসেছে। এর অর্থ হল অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে নানা ধরনের সমাজিক সংকেত সংগ্রহ করে সে তার মননসৌধ গড়ে তোলে। এই সংকেতগুলির মধ্যে ভাষা প্রধানতম এবং ব্যক্তির জীবনচর্চায় যোগাযোগের দক্ষতায় ব্যবহৃত ভাষার অবদান সর্বাধিক।

যোগাযোগের উপাদান (Elements of Communication) :

যোগাযোগের দক্ষতা বোঝার জন্য যোগাযোগের উপাদানগুলি বোঝা দরকার।

(ক) প্রেরক :— যিনি সংকেত বা বার্তা কোন একটি মাধ্যমের দ্বারা গ্রাহকের নিকট তথ্য সঞ্চালন করেন।

(খ) গ্রাহক :— যাকে তথ্য প্রেরণ করা হয় এবং যিনি তথ্য গ্রহণ করে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন।

(গ) বার্তা :— কোন উৎস কর্তৃক প্রেরিত মৌখিক (Verbal) ও অমৌখিক (Non-verbal) সংকেত। যেমন– শব্দ, চিত্র, নড়াচড়া, ভাবভাষা ইত্যাদি।

যোগাযোগের দক্ষতা (Communication Skill) :—

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের দক্ষতা হল—

(i) শোনার দক্ষতা (ability to listen)

(ii) বলার দক্ষতা (ability to speak)

(iii) পড়ার দক্ষতা (ability to read)

(iv) লেখার দক্ষতা (ability to write)

(v) ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা (ability to use language)

(vi) নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা (ability to express one self)

১.৪ শিশুর কথা শেখা (Child Learn to Speak) ঃ

যেকোনো আর্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে ভাষা একটি স্তম্ভের মতো, যার যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে ওই সমাজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পরিচালন করা হয়। শিশু এই আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে যাবতীয় সাংকেতিক ভাষা তথ্য হিসেবে গ্রহণ করে, সেই তথ্য আদান প্রদান করে তথ্যের ভাণ্ডার তৈরী করে এবং জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিনিময় করে, যোগাযোগ প্রক্রিয়া হিসাবে ভাষার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজ গড়ে ওঠে।

শিশু মাতৃভাষায় যখন ভাষাশিক্ষা শুরু করে তখন সে আজকের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে সম্বোধনের মাধ্যমে। ভাইগট্স্কি (Vygotsky) বলেছেন, শিশুর অর্থপূর্ণ ভাষাশিক্ষার সম্ভাব্য দুটি উৎস আছে।

প্রথম : যোগাযোগ অর্থপূর্ণভাবে গড়ে তোলার জন্য শিশু ও বড়রা উভয়েই নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। শিশু তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা প্রথমে নিজে বুঝতে চেষ্টা করে এবং না পারলে প্রয়োজনে তার কাছাকাছি বড়দের ধরে এই বিষয়ে ইঙ্গিতবহ সংকেতগুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষণে বাধ্য করে। বড়রা শিশুর সংকেতগুলি বোঝার চেষ্টা করেন, প্রয়োজনে এসবকে সংশোধন করেন এবং শিশুটি ও এই বিষয়গুলিতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত : সামাজিকভাবে অন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগের ভাষা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং যোগাযোগের উৎস হল :—

(i) অপ্রথাগতভাবে বাবা-মা বা পরিবারের বড়-ছোটোদের কথোপকথন,

(ii) প্রথাগতভাবে স্কুলে শিক্ষক/শিক্ষিকা-ও অন্য সহপাঠীদের কথোপথন।

ভাষা বিকাশে স্তর (Stages of Language Development) :

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ট	**শিশুর কান্না**
১ মাস বয়স	শিশুর অল্প অল্প ধ্বনি
৫ থেকে ৬ সপ্তাহ	(i) গলার ভেতর থেকে গলগল করে শব্দ ব্যবহার করে। (ii) অপরের কথায় সাড়া দেয়
তিনমাস	(i) ঠোঁট, জিহ্বা ও স্বরযন্ত্রের পেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (ii) বাকশক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। (iii) সাড়া পেলে আনন্দিত হয়।
৬মাস	(i) শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। যেমন— মা, দাদা, বাবা, (ii) বাগের কারণে চেচাঁতে পারে।
৭ মাস	(i) একই ধ্বনি বার বার উচ্চারণ করতে পারে, দ্বিত্বস্বর যেমন— মাম-মাম, দাদ-দাদ, বাব, বাব ইত্যাদি। (ii) বড়দের মুখের কথাও অনুসরণ করতে পারে।
১ বছর	(i) শব্দের অর্থপূর্ণ ব্যবহার বুঝতে পারে। (ii) এই সময় শিশুরা নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে থাকে। (iii) নিজস্ব ভাষা শৈলী গড়ে ওঠে।
১৮ মাস	৬ থেকে ২০টি শব্দ বলতে পারে।
২ বছর	৫০ এবং অধিক শব্দ ব্যবহার করতে পারে।
২$^{১}/_{২}$ বছর	(i) সর্বনাম যেমন আমি, তুমি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। (ii) এই বয়সে প্রশ্ন করা শুরু করে।
৩ বছর	অবিরাম কথা বলতে পারে।
৪ বছর	(i) শিশুর ব্যবহৃত ভাষাটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। (ii) ভাষা ব্যবহারের ব্যাকরণের নিয়মরীতি মেনে চলে।

উপরিউক্ত ভাষাবিকাশের স্তর পর্যালোচনা করলে আমরা বলতে পারি যে, প্রথাগতভাবে স্কুলে ভাষাশিক্ষা করার আগেই শিশুটি পরিবারে অপ্রথাগতভাবে প্রতিদিনের জীবনচর্চার কথাবর্তার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষাকারী সংকেতসমূহ আত্মস্থ করে থাকে। অর্থাৎ তার পরিবার-পরিজনের আর্থসামাজিক অবস্থা, পেশা, জীবনচর্চার ধরণ ইত্যাদি সবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ আশেপাশে অন্যদের ভাষা ব্যবহার করতে দেখে সে তা অনুকরণ করতে চায়। এরফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন কতকগুলি ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি সে তৈরী করে চলে, তারফলে প্রতিটি শিশুর

যোগাযোগকারী ভাষার বিষয়টি নিজস্ব, স্বতন্ত্র স্কুলেও গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীর বড়দের শব্দভাণ্ডার প্রায় একই প্রকারের। কিন্তু শব্দগুলি বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়ায়, পরিবেশে প্রয়োগ করার দক্ষতা এক একজন একপ্রকারে আয়ত্তকরে থাকে। পরবর্তীকালে ভাষার এই নিজস্ব বা স্বতন্ত্ররূপ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের ভাষায় পরিণত হয়, অর্থাৎ শিশুর ব্যবহৃত ভাষা যখন বড়রা অনুধাবন করতে পারে না, তখন বড়ো বা শিশুটিকে নিজেদের ভাষায় বলা বা বোঝার জন্য উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়ায় শিশুটিও বড়োদের ভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে শিশুর সংকেত ও ভাষার অর্থপূর্ণতার জন্য তার চারপাশের পরিবেশে ঘটে চলা সামাজিক কথাবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরকে আমরা প্রাক্‌ভাষা শিক্ষার পর্যায় বলে থাকি।

প্রাক্ ভাষাশিক্ষার পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য :—

- এটি অর্থপূর্ণ ও বুদ্ধি দীপ্ত ভাষা আয়ত্তকরার পূর্বস্তর
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
- এই সময় থেকে শিশু অতি দ্রুত ভাষা আয়ত্ত করে ফেলে। তার শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়।
- এই পর্যায়ে শিশু শুধুমাত্র অন্যের অর্থাৎ বড়দের বাক্ অনুকরণ করে ভাষা ব্যবহার করে।
- এই পর্যায়ে শিশুর ভেতরে ভাষার, শব্দের, বাক্যাংশ ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য চাহিদা তৈরী হয়। এবং শিশু বড়দের কাছে প্রশ্নের আকারে জেনে নেবার চেষ্টা করে।
- এই পর্যায়ে শিশুর বাক্-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আত্মগত। কারণ শিশু যখন খেলা করে তখন সে নিজের সঙ্গেই বেশি কথা বলে।

বিকাশের ধারা অনুযায়ী বয়স উপযোগী শিখন :—

এই বয়সের শিশুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি শিশুর স্বাতন্ত্র্যের কথা মাথায় রেখে প্রাক্-প্রাথমিক পাঠক্রম পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ‘বিহান’-এ শিশুর ভাষার বিকাশে ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ :—

- কথ্য ভাষা শোনা, বলা, সামাজিক ভাষা ও আচরণের প্রকাশ।
- বর্ণ চেনার জন্য বই ও গল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- মান্যভাষা ও চলিত ভাষা বুঝতে পারার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।
- ছাপা বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা দেওয়া।
- প্রাকলিখন পর্যায়ে আঁকিবুকি এবং বিভিন্ন নকশার অনুকরণ।

শিখন লক্ষ্য অনুসারে ভাষা বিকাশের কার্যাবলী :—

- ছড়া, গান, গল্প, কথোপকথন, বলাবলি।
- ছবির বই দেখা
- চার্ট
- ধাঁধা
- হতবুদ্ধি করা (Puzzle)
- গল্প বলা

- অভিনয় করা
- ছবি এঁকে বর্ণনা করা
- বিষয়ভিত্তিক কথা বলা।

ভাষা বিকাশের পদ্ধতি :—

প্রাক্ পঠন :—

১. ছবির মাধ্যমে কথোপকথন এবং চেনা ও অচেনার সঙ্গে পরিচিতি ও জ্ঞান

২. গল্প, ছড়া, গান শোনা–বলা–বোঝা।

৩. কথা বলার সময় বিভিন্ন ধ্বনি শনাক্তকরণ

৪. শোনা গল্প, ঘটনা ইত্যাদি পুণরায় বলা

৫. শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি

৬. বই এর সঙ্গে (বিশেষত ছবির বই-এর ক্ষেত্রে) ভালোবাসা ও অন্তদক্ষতা স্থাপন

৭. বই-এর পাতা ওল্টানো।

৮. গল্পের ছবি ও কথা ক্রম সম্পর্কে ধারণা।

প্রাক্ লিখন

১। আঁকিবুকি করা।

২। বালিতে আঙ্গুল সহযোগে দাগ দেওয়া।

৩। দৃষ্টির সঙ্গে বর্ণ বা লোগো মেলানো।

৪। নকশার আদলে বিন্দু যোগ করার ক্ষমতা।

৫। মন থেকে আঁকতে পারার দক্ষতা।

৬। বিভিন্ন বস্তুকে তিন আঙুলের সাহায্যে পৃথকীকরণ।

৭। টুইজার দিয়ে বস্তু ওঠানো এবং সরানোর কাজ।

৮। তিলক মাটি জলে ডুবিয়ে ছবি আঁকার দক্ষতা।

৯। চক দিয়ে মেঝেতে ছবি, নকশা বানাতে পারা।

১০। বাগাডুলি খেলতে পারা।

পঠন ও লিখন

১. বর্ণ চিনতে পারা এবং বিন্দুগুলো জুড়ে লিখতে পারা (ছড়া ও গল্পের ক্ষেত্রে লোগো গ্রাফিক পাঠ)

২. সাধারণভাবে ভাষার জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও প্রয়োগ।

৩. কী, কে, কোথায়, কখন, কেন, প্রশ্নাবলী আলাদা করে মোকাবিলা করা।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি যে শিশুরা তাদের পঠনীয় বিষয়গুলি লিখে ফেলার ব্যাপারে কম আগ্রহ দেখায়, অথচ লিখন হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লেখা ছাড়া শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তাই শিক্ষকের অন্যতম কাজ শিশুটিকে তার বিষয়টি লিখতে আগ্রহান্বিত করা। অবশ্যই লেখাটি অর্থপূর্ণ হতে হবে। ভাইগটস্কি মনে করতেন পড়ার তুলনায় লেখা অনেক বেশি কঠিন ও বিমূর্ত ধরনের ক্রিয়াশীলতা, শিশুরা হয়তো দ্রুত পড়ে ফেলতে শেখে; কিন্তু লিখতে শেখার জন্য তাদের অনেক বেশি সহায়তা লাগে ও কষ্ট করতে হয়। কারণ লেখার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়কে মননক্রিয়ার আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, লেখার দ্বারা শিশুর কাছে শিক্ষণীয় বিষয়টির সার্থকতা, অর্থ, আবশ্যকতা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

৭.৫ শিশুর আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কথা বলার ক্ষমতা (Child ability to speak) ঃ

মানুষের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কথা বলার ক্ষমতা রয়েছে। আর ভাষা হল সেই কথা বলার মাধ্যম। শিশুর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষার বিকাশ শুরু হয়। মনোবিদ আর সীসোর (R. Seashore) এক পরীক্ষা থেকে শিশুদের শব্দভাণ্ডারের (Vocabulary) বিকাশের সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত করেছেন। গড়ে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা কি পরিমাণ নতুন শব্দ আয়ত্ত করে তার তালিকা দেওয়া হল—

১½ বছর বয়সের শিশুদের শব্দভাণ্ডারে থাকে প্রায় ১০-১২ টি শব্দ
২½ বছর বয়সের শিশুদের শব্দভাণ্ডারে থাকে প্রায় ৩০০টি শব্দ
৪ বছর বয়সের শিশুদের শব্দভাণ্ডারে থাকে প্রায় ৫৬০০টি শব্দ
৫ বছর বয়সের শিশুদের শব্দভাণ্ডারে থাকে প্রায় ৯৬০০টি শব্দ

উপরিউক্ত তালিকা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে ভাষার বিকাশ ৩ থেকে ৫ বছর বয়সের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ হয়।

৭.৬ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Preprimary Education) ঃ

কোঠারি কমিশনের মতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হল প্রাথমিক শিক্ষা প্রস্তুতিপর্ব। এই স্তরের শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত, ও স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দ ও তৃপ্তিলাভের মাধ্যমে। আর সেইজন্য শিশুকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা। শিক্ষামূলক কার্যাবলীর দিকগুলি বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিবার ও শিক্ষাসংস্থা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাসংস্থা হিসাবে পরিবার :—

পরিবার সমাজেরই মতো একটি পরিবর্তনশীল সংস্থা। জন্ম থেকে শুরু করে পূর্ণ ও পরিণত মানুষ না হওয়া পর্যন্ত ভাষা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কথা বলার ক্ষমতা বিকশিত করার দায়িত্ব পরিবারের। কারণ শিশুর বেশির ভাগ সময় কাটে তার পরিবারের মধ্যে থেকে, পরিবারের মাধ্যমে প্রচলিত রীতি নীতির ভাষা, পারস্পরিক আচার-আচরণ এবং সম্পর্কের ভাষা আয়ত্ত করে।

শিক্ষাসংস্থা হিসাবে শিক্ষালয় :—

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নানা ধরনের শিক্ষালয় আছে। এই শিক্ষালয়গুলি হল— (১) নার্সারি বিদ্যালয় (২) মন্তেসরি (৩) কিন্ডারগার্টেন (৪) শিশুকেন্দ্র (৫) বাল্য শিক্ষালয়, (৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৭) বালওয়াড়ি বা আই সি ডি এস বা অঙ্গনওয়াড়ি।

এই সমস্ত শিক্ষালয়গুলিতে ভাষাশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'পড়া'র চেয়ে 'কথাবলা'র উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শব্দ লেখা বিভিন্ন কার্ড ব্যবহার করা। শব্দগুলি বারবার পুনরাবৃত্তি করে বাক্য শেখানো হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেবারিজ (Syllabaries)– ab, eb, ib, ob, ub বা ac, ic, oc, uc—এইসব উদাহরণের অনুশীলনের সাহায্যে a, e, i, o, u ইত্যাদি উচ্চারণ সেখানো হয়।

বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে লেখা শিক্ষার অনুশীলন শেখানো হয়, লাইন কার্ড, অক্ষর লেখা, বিভিন্ন আকার যেমন— বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, চোঙ ইত্যাদি এঁকে রং করতে শেখানো হয়।

গাণিতিক বিকাশের জন্য আঙুল গণনা, কাঠের ব্লকের সাহায্যে গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণ প্রভৃতি শেখানো হয় নানা উপকরণের মাধ্যমে, ছোটো ছোটো অংক শেখানো হয়।

জীবজন্তুর ছবি, বিভিন্ন পরিবেশের ছবি, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সিনেমা দেখানো ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়।

বিভিন্ন মনীষীদের কাহিনী, ধর্মীয় গল্প, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি গল্পের ক্লাস, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে কথা বলার ক্ষমতা শেখানো হয়।

শিশু এই বয়স-পর্যায়ে বাড়ির মানুষজনের সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে এবং বড়দের ভাষায় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরটি ছিল 'বাক্' তৈরীর স্তর। এই পর্যায়ে চিন্তা ও বাক্ তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও চিন্তা এবং ভাষা দুটি পথে অগ্রসর হলেও এদের উৎস এক ও অভিন্ন। কারণ পরবর্তীকালে এদের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৭.৭ প্রথাগত শিক্ষাস্তরে যোগাযোগের আদান-প্রদান (Communication process in Primary Education) ঃ

প্রথাগতভাবে স্কুলে ভাষাশিক্ষা করার আগে শিশুটি অপ্রথাগতভাবে প্রতিদিনের জীবনচর্চার মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সংকেতগুলো আত্মস্থ করে থাকে। আর যখন প্রথাগত শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে, তখন সে শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর মধ্যে তার চারপাশে জীবনচর্চাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। এই স্তরে চিন্তা ও 'বাক্'-এর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বহু ক্ষেত্রে জটিল, দুরূহ এবং প্রত্যক্ষ হয়। তাই প্রথাগত শিক্ষার বিষয়গুলি শিশুটির কাছে জটিল, দুর্বোধ্য ও ভারী মনে হয়, কারণ পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত সংকেতগুলি সুস্তবদ্ধ, প্রণালীবদ্ধ, পূর্ণাত্মক এবং সামাজিক ও পরিবেশকে সুন্দরভাবে সকলের কাছে পেশ করতে এবং সকলের মধ্যে সঞ্চালিত করতে সাহায্যে করে, এই সময় শিশু ভাষা ব্যবহারের উদেশ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, ভাষার আকারে শব্দভাণ্ডারগুলোকে চমৎকারভাবে আত্মস্থ করছে এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। বাক্ ও চিন্তা এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়ে।

ভাইগটস্কির মতে জীবনচর্চার বৃদ্ধি-বিকাশকালে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষার মাত্রা বিকশিত হয় (i) মননগত স্তরের ভাষা (ii) সামাজিক ভাষা।

i) মননগত স্তরের ভাষা : প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের বাক্ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আত্মগত। কিন্তু এইস্তরে শিশুর সামাজিকীকরণ ঘটতে থাকে এবং তার বাক্, চিন্তা, ভাষা পরিণতি লাভ করে। এর ফলে সাত-আট বছরের মাথায় তার এই আত্মগত বাক্ ক্রমশ মিলিয়ে যায় এবং তার ভাষা সামাজিক ভাষায় পরিণতি লাভ করে। মননগতস্তরে দুটি দিক বিকশিত হয়। (i) ক্রিয়াত্মক দিক (ii) ভাবাত্মক দিক। এই পর্যায়ে ক্রিয়াত্মক এবং ভাবাত্মক প্রক্রিয়া যুগবৎ কাজ করে চলে। এর সার্থক রূপায়নের জন্য ভাষা

ব্যবহারের নিয়মসূত্রগুলি অর্থাৎ ব্যাকরণ চর্চা করা জরুরি হয়ে পড়ে। শিশুটি ক্রমশ প্রাপ্তবয়স্কদের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। বাস্তবতার প্রতিফলন হিসাবে ভাষা ব্যবহৃত হয়, পুনর্গঠিত হয়ে মনে অভিজ্ঞতারূপে সঞ্চিত হয়। ক্রমশ এই ভাষা গড়ে ওঠার মাধ্যমে ব্যাকরণ তৈরি করে, বিশেষভাবে যখন সে লিখিত ভাষার দশায় গিয়ে পৌঁছায়। কারণ লিখিত ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হয়। তাই প্রারম্ভিক স্তরে ব্যবহৃত লিখিত ভাষার জন্য যথাযথ ব্যাকরণ শেখার প্রয়োজন হয়। কারণ ভাষার ব্যবহার অর্থপূর্ণ হতে হয়। এই স্তরে লেখার কাজ শুরু হওয়ার ফলে মননগতস্তরে বেশি পরিমাণে বিমূর্ত ক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় কাজ করে। এরফলে কথোপকথনে ভাষাকে যথাযথভাবে ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়। কারণ মননগতক্রিয়ার মধ্যে ZPD (Zone of Proximal Development) সার্থকতা নিহিত থাকে।

ii) সামাজিক ভাষা : শিশুর ভাষাশিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার সামাজিক জীবনচর্চার প্রভাব সর্বাধিক। এই ধরনের কর্মতৎপরতার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে শিশুরা তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করে। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার উৎস হল (i) পাঠ্যপুস্তক, (ii) গল্প (iii) উপন্যাস (iv) গণমাধ্যম (রেডিও, দূরদর্শন, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র) (v) সহপাঠীদের সঙ্গে কথোপথন (vi) ক্লাব ইত্যাদি। অর্থাৎ সামাজিকভাবে অন্যদের সঙ্গে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে সামাজিক ভাষা তৈরি হয়। এটি পরবর্তীকালে কথ্য ও লেখার যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সময়কাল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। কোঠারী কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় ৫ বছর বা ৬ বছর বয়সে। এই শিক্ষা চলবে একটানা ৭ বছর। অর্থাৎ নিম্নপ্রাথমিক ৫ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তর ১১ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত। এই স্তরে শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তির মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে শুধু তাই নয়— চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশেও সহায়তা করে।

বিকাশের ধারা অনুযায়ী বয়স উপযোগী শিখন : এই বয়সের শিশুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি শিশুর স্বাতন্ত্র্যের কথা মাথায় রেখে নিম্ন প্রাথমিকস্তর ও উচ্চপ্রাথমিক পাঠক্রমের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে শিশুর ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ—

১। শোনা
- সমাজ থেকে
- সহপাঠীদের থেকে
- শিক্ষকের থেকে
- বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে
- নাটক থেকে
- যাত্রা থেকে

২। শোনা থেকে বলার দক্ষতা বিকাশ লাভ করে

৩। পড়ার দক্ষতা
- পাঠ্যপুস্তক
- অন্যান্য যেমন- সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, কমিকস্, বিজ্ঞাপন

৪। লেখার দক্ষতা বিকশিত হয়— (i) প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে

(ii) মৌলিক রচনার মাধ্যমে।

(iii) সৃজনাত্মক (কল্পনা নির্ভর ও বাস্তবনির্ভর) কার্যাবলীর মাধ্যমে

প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক কাঙ্খিত ও সামর্থ্যগুলি অর্জনের কার্যাবলী —

কাঙ্খিত সামর্থ্য :

- শিক্ষা সহায়ক প্রশ্ন করার ক্ষমতা।
- যুক্তিসংগত প্রশ্ন করার ক্ষমতা।
- বিতর্কে অংশগ্রহণের ক্ষমতা।
- বিভিন্ন তথ্যের নিরিখে সাধারণীকরণের ভিত্তিতে আরোহী সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষমতা।
- ব্যাকরণগত সূত্রাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা।
- অপরিচিত পরিবেশেও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলতে পারার ক্ষমতা।
- আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা।
- মান্য ভাষায় বলা ও লেখার ক্ষমতা।
- নতুন জানা বিষয় সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার ক্ষমতা।

শ্রেণিকক্ষে প্রকাশের কার্যাবলি :

- গল্প সম্পূর্ণকরণ
- আঁকা সম্পূর্ণকরণ
- শ্রুতিলিখন
- অনুবাদ
- মৌলিক রচনা
- প্রতিবেদন রচনা
- কবিতা
- গান
- দেয়াল পত্রিকা
- পোস্টার লিখন
- ডায়েরি লেখা
- সংলাপ
- নাটক
- পত্রপত্রিকা সম্পাদনার ক্ষমতা
- প্রদর্শনী ইত্যাদি

৭.৮ সারসংক্ষেপ (Let us Sum up) ঃ

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিশু শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে ভাষাগত ও ভাষাবিহীন এই দুইভাবেই যোগাযোগ করে থাকে। শিশু যে সমস্ত শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করে, সেটিই হল ভাষাগত যোগাযোগ প্রক্রিয়া। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় দুভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে (i) মৌখিক ও (ii) লিখিত। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে শিশু তার মনের ভাব, তথ্য, অনুভূতি প্রভৃতি আদান-প্রদান করে থাকে। শিশু চিন্তন ও কল্পনের দ্বারা নিজেই নিজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আবার শিশু সহযোগী বন্ধুদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মুখোমুখি যোগাযোগ করে থাকে। তাই যোগাযোগ ও শিশু কীভাবে যোগাযোগ করে থাকে সাধারণভাবে তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৯ অনুশীলনী (Unit End Exercise) ঃ

১) নীচের প্রশ্নগুলির দুই-এক কথায় উত্তর দিন। (অনধিক ৬০টি শব্দে)

(ক) যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?

(খ) যোগাযোগের উপাদানগুলি কি কি?

(গ) শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগের দক্ষতাগুলি কি কি?

(ঘ) শিশুর কথা শেখার উৎসগুলি কি কি?

(ঙ) কোঠারি কমিশনের মতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

(চ) ভাইগাস্কির মতে বৃদ্ধি বিকাশকালে কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষার মাত্রা বিকশিত হয়।

(ছ) মননগত স্তরের ভাষা বলতে কি বোঝ।

(জ) সামাজিক ভাষা বলতে কি বোঝ।

(ঝ) যোগাযোগ প্রক্রিয়া কিভাবে কার্যকরী হয়।

২। নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (অনধিক ১৫০টি শব্দে)

(ক) শিশু কিভাবে কথা শেখে?

(খ) প্রাক ভাষাশিক্ষার পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(গ) পরিবার থেকে শিশু কিভাবে ভাষা শেখে?

(ঘ) প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিকস্তরে কাঙ্খিত সামর্থ্যগুলি কি কি?

৩। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (অনধিক ২৫০টি শব্দে)

(ক) শিশুর আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কথা বলার ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) শিশুর ভাষা বিকাশের স্তরগুলি আলোচনা করুন।

(গ) প্রথাগত শিক্ষাস্তরে যোগাযোগের আদান প্রদান কিভাবে হয় আলোচনা করুন।

৭.১০ উত্তর সংকেত (Hints to Answer) ঃ

১। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে নানা ধরনের সামাজিক সংকেত ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে ভাষা প্রধানতম।

২। যোগাযোগের উৎসগুলো হলো i) অপ্রথাগতভাবে বাবা-মা বা পরিবারের বড় ছোটদের কথোপকথন।

৩। ভাইগটস্কির মতে জীবনচর্চার বৃদ্ধি-বিকাশকালে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষার মাত্রা বিকশিত হয় i) মননগত স্তরের ভাষা ii) সামাজিক ভাষা।

পাঠ একক - ৮

গঠন (Structure)

৮.১ ঃ সূচনা

৮.২ ঃ উদ্দেশ্য

৮.৩ ঃ প্রক্রিয়াগত ভাবে শিক্ষণ-শিখনের উন্নয়ন

৮.৪ ঃ প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ - শিখন দক্ষতা

৮.৫ ঃ প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখনের বিভিন্ন ধারা

৮.৬ ঃ পরিকল্পনা

৮.৭ ঃ পাঠ পরিকল্পনার প্রকারভেদ

৮.৮ ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত পাঠপরিকল্পনা

৮.৯ ঃ সারসংক্ষেপ

৮.১০ ঃ অনুশীলনী

একক - ৮

প্রক্রিয়াগতভাবে শিক্ষা-শিখণের দক্ষতার উন্নয়ণের পরিকল্পনা — প্রি-ইনটার্নশিপ এবং ইনটার্নশিপ
[Process-based skill enhancing teaching-learning Plan – Pre-Internship and Internship]

৮.১ সূচনা (Introduction):

NCF-2005 এবং RTE-2009 এই দুটি দলিলে বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনকে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণে প্রক্রিয়াগতভাবে শিখন-শিখনের দক্ষতা উন্নয়নের পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী। এই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE) ও আধুনিক পাঠক্রমের নির্দেশিকা অনুযায়ী PBTL (Process-based teaching-learning) দক্ষতার উন্নয়নে প্রি-ইনটার্নশিপ (Pre-Internship) এবং ইনটার্নশিপ (Internship) পর্বে পরিকল্পনা রূপায়নের লক্ষ্যে এই অধ্যায় লেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে PBTL-এর সম্পর্কে জানতে পারবে এবং পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রগুলি বুঝতে পারবে।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই এককটি পাঠ করে আপনি —

১) শিক্ষক শিক্ষণে প্র্যাকটিস টিচিং বা ইনটার্নশিপ সম্পর্কে ধারণা হবে।

২) শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুইটি সমকালীন বিষয় প্রক্রিয়াগতভাবে শিক্ষণ-শিখন দক্ষতাও পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

৩) PBTL-এর রূপায়ণের কারণ উদ্দেশ্য ও দক্ষতার প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

৪) প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখনের দক্ষতার অর্জনের কৌশল হিসাবে পাঁচটি পটুত্ব সম্পর্কে অবগত হবেন।

৫) শিক্ষার্থী-শিক্ষক পাঠপরিকল্পনা (Lesson-Plan), পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পাঠপরিকল্পনার প্রকারভেদ ও পাঠটীকা গঠন সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

১.৩ প্রক্রিয়াগতভাবে শিক্ষণ-শিখনের দক্ষতার উন্নয়ন (Process based skill enhancing teaching learning):

শিশুকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান কার্যকর করার ক্ষেত্রে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। RTE Act এবং CCE অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করার এক গুরুত্ব কৌশল হল প্রক্রিয়াগতভাবে শিক্ষণ-শিখণের দক্ষতার উন্নয়ন (Process-based skill enhancing teaching-learning)। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য যাচাই করা যায়, বোঝা যায় শিক্ষার্থী তার অর্জিত সামর্থ্যকে ব্যবহারিক জীবনে প্রযোজ্য করতে পারছে কি না, তা দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে কি না এবং মূল্যবোধের বিকাশসাধন হচ্ছে কি না। প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতায় (Process-based skill) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিজের চিন্তাকে কাজে লাগাবার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সনাক্ত করে সংগঠন পাঠের ক্ষেত্রে Process-based skill (PBS) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব হয়। আর শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষণ-শিখন কর্মসূচির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

প্র্যাকটিস টিচিং/ইনটার্নশিপ :

বর্তমানকালে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা গতানুগতিক পথ ছেড়ে সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি স্তরে আধুনিক পাঠক্রম, মূল্যায়নের নিত্য নতুন প্রথা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তার ফলে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের কৌশল

সমস্যায় ভুগছে। কারণ শিক্ষক পেশায় নিযুক্ত হতে গেলে অথবা নিযুক্ত হওয়ার পর সার্থক শিক্ষাদানের স্বার্থে দু ধরনের প্রস্তুতি জরুরি —

এক) প্রি-সার্ভিস টিচার ট্রেনিং (চাকরির পুর্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ)

দুই) ইন-সার্ভিস টিচার ট্রেনিং (চাকরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ)

শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিস টিচিং (Practice-teaching)-এর গুরুত্ব অসীম। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে —

- শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে ভাষাগত দক্ষতা ও উন্নত পাঠদান কৌশল আরও করা।
- একজন ট্রেনি (Trainee) স্বাধীনভাবে কিভাবে পাঠটীকা (Lesson plan) তৈরী করতে পারবে।
- শিক্ষার্থী শিক্ষকরা (Trainee-Teacher) জানতে পারবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিভাবে সে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শেষ করবে।
- শিক্ষাদান সম্পর্কিত কতকগুলি প্রক্রিয়াগত দক্ষতা (Process-based) আয়ত্ত করতে পারে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- ট্রেনি টিচারদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও সময় জ্ঞান ব্যবস্থাপনার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ (Social work), সহ-পাঠক্রমমূলক কাজ, বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত পরীক্ষাগার এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্যপথে এগোতে পারে তার সুযোগ তৈরি করা হয়।

এই উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান
- পেশার প্রতি আগ্রহ বা মনোভাব
- পেশাগত দক্ষতা
- পেশাগত নিয়মবিধি ও মূল্যবোধ

শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা :

শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক শিক্ষণে দুইটি সমকালীন বিষয় :

১) প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা (Process-Based Teaching-Learning Skill)

২) পাঠ পরিকল্পনা (Lesson-Plan)

৮.৪ প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা (Process-Based Teaching-Learning Skill) :

NCF-2005 এবং RTE-2009 এই দুটি দলিলে বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠনকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলার লক্ষ্যে Process-Based Teaching-Learning (PBTL)-কে একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ হিসাবে ধরা হয়েছে।

এই উদ্যোগের সূচনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE) ও আধুনিক পাঠক্রম 2013 এর নির্দেশিকাকে সামনে রেখে PBTL পরিকল্পনাটির রূপরেখা তৈরী করা হল।

PBTL এর রূপায়নের কারণ :

একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিদ্যালয় স্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যহীন মুখস্থ বিদ্যাকে অবলম্বণ করে পাঠদানের প্রবণতাকেই ছাত্রছাত্রীদের প্রথম থেকে শ্রেণি, পাঠগ্রহণে বিমুখ করে তোলার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাঠদানকে আকর্ষণীয় করে তোলার অক্ষমতাকে এক্ষেত্রে দায়ী করা যায়।

PBTL এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য :

PBTL এর মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঃ—

১) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

২) সক্রিয়তাভিত্তিক বা হাতে কলমে শ্রেণি শিখন

৩) পরীক্ষালব্ধ ফলের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা

৪) কোন সমস্যা যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করার প্রবণতা বৃদ্ধি করা।

৫) প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের কর্মপত্রের (Work Sheet) মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা (CCE) এবং প্রত্যেকের কাঙ্খিত দক্ষতার ক্রমান্বয় উন্নতি সাধন নিশ্চিত করা।

৬) দলগত কাজের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৭) স্বল্প মূল্যের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ এবং দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের সাহায্যে পাঠদানের ব্যবস্থা করা।

৮) পাঠ্যপুস্তক বা সিলেবাসের নির্দিষ্ট চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ মানসিক বিকাশের উদ্দেশ্যে পরিবেশ, সমাজ বিষয়সমূহ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে, নিয়মিত বিতর্কসভা, নাটক, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির আয়োজন করা।

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতার প্রকৃতি :

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা (Process-Based Teaching-Learning-PBTL) হচ্ছে স্বল্প সময়ের দলগত (Peer-group) শিক্ষণ অনুশীলন যার দ্বারা ট্রেনি টিচারদের শিক্ষণ দক্ষতার (Teaching-Skill) বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে একজন ট্রেনি টিচার বা শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষকের ভুমিকায় অন্য ট্রেনি ছাত্রদের সামনে শিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দক্ষতা অনুশীলন করে থাকেন। শিক্ষকের ভূমিকায় পাঠদান শেষ হলে তার শিক্ষাদানের ত্রুটি থাকলে ও ধরানোর উপায় এবং উন্নতি পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্যান্য ট্রেনি শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা করে থাকেন। এর পর যে ট্রেনি, শিক্ষকের ভূমিকায় পাঠদান করেছে যে ছাত্ররূপে যোগ দিয়ে অন্য ট্রেনি শিক্ষকের পাঠদানে ফিডব্যাক (feedback) প্রক্রিয়ায় যোগ দেন। এইভাবে শিক্ষণ-শিখন চক্র (Teaching-Learning Cycle) চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কৃত্রিম শ্রেণিপরিবেশে কাঙ্খিত আচরণে পৌঁছাতে না পারে। এর দ্বারা ট্রেনি শিক্ষক পরবর্তী ক্ষেত্রে এই আচরণমূলক দক্ষতা বাস্তব শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর সময় সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা (PBTL) আদলে ছোটো কোনও বিষয়গুচ্ছ নিয়ে ছোটো দলে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এখানে অনুশীলনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পরিস্থিতি থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতার ধারণা :

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন (PBTL) ট্রেনি টিঁচারকে বাস্তব শ্রেণিশিক্ষায় পালনীয় দক্ষতা (Skill) অর্জনে সাহায্য করে এবং শিক্ষাদান সম্পর্কিত দক্ষতা শেখায়।

- শিক্ষাদান সম্পর্কিত সমস্যাগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।
- ট্রেনি টিচাররা বিভিন্ন ভূমিকায়, যেমন শিক্ষক, ছাত্র, পর্যবেক্ষক রূপে পাঠদান অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।
- শিক্ষাদানের জটিলতা PBTL-এর দ্বারা কমানো যায়।
- ছোটোদলে (Peer group) ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচি।
- 'feed back' এর মাধ্যমে পাঠদান দক্ষতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।
- শিক্ষকের সমালোচনা, কর্মসম্পাদন রেকর্ড করে ভিডিও ফিল্মের (Video film) সাহায্যে বার বার অনুশীলন করার সুযোগ থাকে।

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখনের উপাদান :

১) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা — ৫-১০ জন

২) পাঠদানের সময় — ১০ মিনিট

৩) বিষয় উপস্থাপন — একক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে

৪) শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা অর্জন — প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা (PBTL) পাঠক্রমের একটা নবতম অধ্যায়। গুণগত উৎকর্ষের শিক্ষক-শিখণ কর্মসূচিতে এটি সংযোজিত হয়েছে। এটি সমন্বিত পদ্ধতির দ্বারা পটুত্ব আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক শিক্ষণ-শিখন কৌশল হিসাবে গণ্য করা হয়। নির্মিতিবাদের ভিত্তিতে ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংস্থা D. EI. Ed. পাঠ্যক্রমে ১৩.২.১৩ এবং ১৪.২.১৩ কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচটি পটুত্ব গ্রহণ করেছেন। এই পাঁচটি পটুত্ব হল —

(ক) সমন্বিত অনুবন্ধকরণ (Skill of Integration through corrctation of subjects)

(খ) শিশুকেন্দ্রিক পাঠ পরিচিতকরণ (Skill of Introducing Child Centric lesson)

(গ) শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ (Skill of Encouraging Questioning by the lessoner)

(ঘ) শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক পর্যবেক্ষণ (Skill of Encourging observation by the learners)

(ঙ) কলাকৌশল উপস্থাপনের সমন্বয়সাধন (Skill of Integrating Performing Art in Learning)

5) **ফিডব্যাক :-** শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ট্রেনি বিচারদের ছোটো দলে feedback Sheet এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী শিক্ষকের স্বাক্ষর জরুরী।

6) **পরীক্ষাগার :-** শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া অনুশীলন এবং চর্চা করার জন্য সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন (PBTL) পরীক্ষাগার কক্ষ থাকা জরুরী।

৮.৫ প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখনের বিভিন্ন ধাপ (Step for process based teaching learning):

১) PBTL-এ তিনটি ধাপে করা যেতে পারে —

ক) প্রস্তুতি স্তর।

খ) উপস্থাপন ও অনুশীলনী স্তর।

গ) মূল্যায়ন ও পুণর্মূল্যায়ন স্তর।

প্রস্তুতি স্তর :

- এই স্তরে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষণীয় দক্ষতাকে নির্দিষ্ট করে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং শিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের আচরণের কী পরিবর্তন আসতে পারে তার ব্যাখ্যা দেবেন। দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করবেন।

- শিক্ষার্থী শিক্ষক (Trainee Teacher) ‘‘দক্ষতা’’টিকে উপস্থাপন করা যাবে এ ধরণের স্বল্প সময়ের পাঠদানের জন্য পাঠটীকা রচনা করবেন। পাঠটীকার রূপরেখা নিম্নে বর্ণনা করা হল, যার দ্বারা শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা নিজেরা পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করবেন।

পটুত্ব বা দক্ষতার নাম ঃ

ব্যবহৃত আচরণাঙ্গ ঃ

স্থান ঃ শিক্ষা সংস্থার নাম

বিষয় ঃ

শ্রেণি ঃ

বিষয়বস্তু ঃ

শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সংখ্যা ঃ

অদ্যকার পাঠ ঃ

সময় ঃ ৬-১০ মিনিট

শিক্ষকের ভুমিকায় শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ও ক্রমিক নং ঃ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া	শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া	আচরণাঙ্গ

উপস্থাপন ও অনুশীলন স্তর

এই স্তরে ট্রেনি টিচার ছোটো একটি ছাত্রছাত্রীদলে (৫ থেকে ১০ জন) এই পাঠটীকার ভিত্তিতে একটি মাত্র দক্ষতা (Skill) অর্জনের জন্য পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করবেন। কোন একজন টিচার এডুকের্টর এবং অন্য একটি ট্রেনি টিচারের দল (Peer group) সেটি পর্যবেক্ষণ করবেন। আচরণাঙ্গ অনুযায়ী অত্যন্ত প্রাজ্জলভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন। সকল অংশগ্রহণকারী ট্রেনি শিক্ষক পর্যায়ক্রমে পাঁচটি দক্ষতা উপস্থাপন ও অনুশীলন করবেন।

মূল্যায়ন ও পুর্ণমূল্যায়ন স্তর

ট্রেনি শিক্ষক পর্যবেক্ষণ তালিকায় (observation sheet) আচরণাঙ্গ অনুযায়ী তথ্য লিপিবন্ধ করবেন। টিচার এডুকেটর পাঠ উপস্থাপনের ভিত্তিতে পরামর্শ দেবেন (feedback) এর ভিত্তিতে আগের ভুলও ধরিয়ে "দক্ষতা" নির্দেশক পাঠটীকাটি ট্রেনি টিচার পুনপরিকল্পনা করবেন (Replaning the lesson)। ট্রেনি টিচার আবার নতুনভাবে পরিকল্পিত পাঠটীকার সাহায্যে দক্ষতাটি ছোটোদলের মধ্যে অনুশীলন করবেন। এইভাবে চক্র (cycle) চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেনি টিচার দক্ষতার শিক্ষণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পাবে।

প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা ও তার ব্যবহৃত আচরণ :

শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সাজিয়ে নেবেন। এই প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণমূলক, শ্রেণি সক্রিয়তার নথি, কর্মপত্র, বিভিন্ন সক্রিয়তার পরিমাপক নথি, চেক লিস্ট (check list) পোর্টফোলিও প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। অবশ্যই শিক্ষককে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ নির্মিতিবাদ অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি মাথায় রেখে প্রক্রিয়াগত শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা ও তার ব্যবহৃত আচরণগুলি তৈরী করা হয়। আমরা জানি Interpretation Construction (ICON) Model-এ নিম্নলিখিত শিখন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি উল্লেখ করা হয়। ১) নিরীক্ষা, ২) পূর্বসূত্র স্থাপন, ৩) জ্ঞানগত শিক্ষানবিশি ৪) সহযোগ ৫) ব্যাখ্যা ও নির্মিত ৬) বহুমুখী ব্যাখ্যা ৭) বহুমুখী উপস্থাপনা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন জ্ঞান-নির্মাণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে শিখন পরিবেশ প্রস্তুত করা হয়। তাই বর্তমান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত দক্ষতা ও তার ব্যবহৃত আচরণসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ কাঠামো তৈরী করে অনুশীলন করতে পারেন।

১) দক্ষতা :

সমন্বিত অনুবন্ধকরণ (Skill of Interpretation through correlation of subjects) :

ব্যবহৃত আচরণ :

১) শিক্ষার্থীরদ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গো সমণ্বয়করণ (Intergration through corrclation of subjects by the student)

২) শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দৃষ্টান্তগ্রহণ (To receive instance from the student)

৩) শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ দেওয়া (To cite a proper example by the student)

৪) সাধারণীকরণ (Generalization)

২) দক্ষতা :

শিশুকেন্দ্রিক পাঠ পরিচিতিকরণ (Skill of Introducing child Centric Lesson)

ব্যবহৃত আচরণ :

১) শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ (Student Active Participation)

২) ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ (To concent to continuity with the subject)

৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া (Each other interacton in the student)

৪) শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত করণ গ্রহণ (Student Conclusion)

৩। **দক্ষতা :**

শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ (Skill of encouraging questioning by the learners)

ব্যবহৃত আচরণ :

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ (Questioning by the student)

২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা (Flexibility of Questioning)

৩। প্রশ্নকরণের পরিমীতিবোধ (Unit of Questioning)

৪। বিষয়কেন্দ্রিক বা সম্পর্কিত প্রশ্ন (Related Question with main subject)

৪। **দক্ষতা :**

উৎসাহমূলক পর্যবেক্ষণ (Skill of Encouraging observation by the learners) :-

ব্যবহৃত আচরণ :

১) শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণকরণ (Observation by the learners)

২) পুনঃবার বিশেষ পর্যবেক্ষণকরণ (Seeking further observation)

৩) শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকরণ সম্পর্ক স্থাপন (To apply the causual)

৪) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনাকরণ (Observation & Articulation)

৫। **দক্ষতা :**

কলাকৌশল উপস্থাপনের সমন্বয়সাধন (Skill of Intergration Performing Art in Learning Situation)

ব্যবহৃত আচরণ :

১) শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ (Learner Active Participation)

২) সৃজনশীলতা (Creativity)

৩) বিষয়বস্তুকে নাট্যরূপান্তরকরণ (Dramatisation)

৪) বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক (Related to the subject)

৮.৬ পাঠপরিকল্পনা (Lesson Paln) :

যে কোন শিক্ষক যতই অভিজ্ঞ এবং কার্যক্ষম ব্যক্তি হোক না কেন তিনি পূর্ব প্রস্তুতি পাঠদান করলে সেই পাঠদান কার্যকরী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য যে কোন পাঠদান কার্যকরী করে তুলতে পাঠপরিকল্পনার দ্বারা পূর্ব থেকে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :

- পাঠপরিকল্পনার সাহায্যে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং পাঠদানকে কার্যকরী হয়।
- পাঠপরিকল্পনার দ্বারা পাঠদানের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হন।

- শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয় ও সক্রিয়তাভিত্তিক করার জন্য যথাযথ শিখন সহায়ক উপকরণ প্রয়োগ করতে পারেন।
- পাঠপরিকল্পনার সাহায্যে তত্ত্বগত জ্ঞান যথাযথভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- সময় ও শক্তির অপচয় কম হয়।
- পাঠপরিকল্পনার সাহায্যে বিষয়বস্তুকে ঠিকমত সুবিন্যস্ত করে সঠিক পদ্ধতির দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

পাঠপরিকল্পনার গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান :

শিক্ষক পাঠপরিকল্পনা রূপায়নের প্রস্তুতি হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

১) কোন দর্শনের ভিত্তিতে পাঠপরিকল্পনার লক্ষ্য রূপায়িত হবে সে সম্পর্কে সুষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

২) শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশনার যে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। আমরা জানি শিক্ষার সাধারণ ও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সাধারণ উদ্দেশ্য শব্দটি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। সাধারণত উদেশ্যগুলি বিভিন্ন দর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি হল —

   - ব্যক্তির সর্বাঙ্গিন বিকাশ
   - ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা
   - ব্যক্তির মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো
   - ব্যক্তির অবসর বিনোদনে সাহায্য করা।
   - এছাড়া প্রতিটি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক সাধারণ উদ্দেশ্য আছে যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্তর পার করে এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

বৃহৎ সাধারণ উদ্দেশ্যগুলির কথা মাথায় রেখে ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট কতকগুলি ছোটো ছোটো নির্দেশনামূলক বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা মাথাই রেখেই শিক্ষক শিখন-প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলী (Instrucational objectives) শিক্ষার্থীর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় এবং এগুলো পরিমাপযোগ্য। সুতরাং শিক্ষণ-শিখনে প্রক্রিয়াতে শিক্ষকের কাছে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩) শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শিক্ষণ উপকরণসমূহ সম্পর্কে ধারণা :-

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু পাঠদানে কী কী শিখন শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করবেন সেগুলি সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণি এবং বয়সভিত্তিক সামর্থ্য অনুসারে নতুন নতুন Low-cost-no-cost Activity/Experiment-Design প্রস্তুত করবেন।

বিষয় জ্ঞান :-

যে বিষয়টি পাঠ দেবেন সে সম্পর্কে শিক্ষকের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। এবং বিষয়বস্তুকে ছোটো ছোটো উপএককে বিশ্লেষণ করে যে কোন একটি উপএকককে নির্বাচন করে 35 থেকে 40 মিনিটে উপযোগী পাঠপরিকল্পনা রচনা করবেন।

শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা :-

শিক্ষক যাদের পাঠদান করবেন তাদের বয়স ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের উপযোগী করে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করবেন।

পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান :-

শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষণ কৌশল নির্বাচিত, পরিকল্পিতও গঠিত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মত বিনিময়ের দৃষ্টিভঙ্গি হল শিক্ষণ প্রণালী (Approach of teaching)। আর শিক্ষক যদি কোনো কাজ প্রণালীবদ্ধভাবে করেন তবে তাকে পদ্ধতি (Method) বলা হয়। বাইরের পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সমণ্বয় সাধনের জন্য প্রণালীবদ্ধভাবে তথ্যকে শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থাপন করান হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শিক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Teaching)। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে তিনটি বিষয় অর্থাৎ কৌশল (technique), শিক্ষণ প্রণালী (approach) ও পদ্ধতি (Method) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আকাঙ্খিত পরিবর্তন নিয়ে আসে। এরা একে অপরের পরিপূরক বা বলা যেতে পারে এদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে।

সুতরাং কোনো লক্ষ্য বা নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যকে সমানে রেখে প্রণালীবদ্ধভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করাকে বলা হয় কৌশল। এটা দেখা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদ্ধতি প্রয়োগের সময় কৌশলও ব্যবহার করা হয়। আবার একাধিক প্রণালী মতবিনিময় বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। এই বিনিময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, বা বিষয়বস্তু-শিক্ষার্থীর মধ্যে হতে পারে। ফলে শিক্ষককে প্রথমেই শিক্ষণ ও শিখন ভালোভাবে বোঝার জন্য এই তিনটি ধারণা সম্পর্কে পরস্পর জ্ঞান লাভ করতে হবে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রশ্নকরণ (Questioning) মত বিনিময়ের একটা প্রধান উপাদান। এটা যেমন শিক্ষণ প্রণালী (approach of teaching)'র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি শিক্ষণ কৌশল (technique of teaching) হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রকাশের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও দলগতভাবে হাতে কলমে সক্রিয়ভাবে নিজেরাও এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। তুমি কী করলে? তুমি কী দেখেছ? বলার পর বোর্ডে লিখতে পারেন ও সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকতে পারেন। এগুলি সবই পৃথক পৃথক শিক্ষা কৌশল (technique of teaching)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি Lecturing, Demonstration, Narration, Use of Black-board, Experimenting, Questionning প্রভৃতি শিক্ষক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। অবশ্যই এই বিনিময় শিক্ষককেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক বা বিষয়কেন্দ্রিক অথবা এগুলির মিশ্রণ দ্বারা হতে পারে। শিক্ষক তার প্র্যাকটিস্ টিচিং না ইনটার্নসিপের সময়কালে অনুশীলনের মাধ্যমে এই কৌশল, প্রণালী ও পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকবেন।

৮.৭ পাঠপরিকল্পনার প্রকারভেদ (Different types of Lesson Plan) :

লিখিত পাঠটীকার বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের পাঠপরিকল্পনা চালু আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রীতিগুলো হল :-

১) হার্বার্টের পঞ্চসোপান অ্যাপ্রোচ (Herbartion Five step Approach)

২) ব্লুমের মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচ (Bloom's Evaluation Approach)

৩) ধারণা-নির্মাণভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা (ICON Model)

১) হার্বাটের পঞ্চসোপান পদ্ধতি (Herbartion Five Steps) : পাঠপরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক প্রাচীন ধারণা। হার্বাট যে পঞ্চসোপানের উল্লেখ করেন তা হল —

১) প্রস্তুতি বা আয়োজন (Preparation)

২) উপস্থাপন (Presentation)

৩) তুলনা (Comparison and abstraction)

৪) সামান্যীকরণ বলসূত্র গঠন (Generalisation)

৫) প্রয়োগ বা অভিযোজন (Application)

উপরিউক্ত পঞ্চসোপানের ভিত্তিতে পাঠটীকার গঠন নীচে দেওয়া হল :—

পাঠটীকা (Lesson Plan)

বিদ্যালয়ের নাম :—	বিষয় :—
শ্রেণি :—	একক :—
শিক্ষার্থীর সংখ্যা :—	উপএকক :—
গড় বয়স :—	আজকের পাঠ :—
শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম —	
সময় :—	
তারিখ :—	

সাধারণ লক্ষ্য :—
বিশেষ লক্ষ্য :—

শিক্ষা সহায়ক উপকরণ :
পূর্বজ্ঞান :
আয়োজন :
পাঠঘোষণা :
উপস্থাপন :
অভিযোজন :
বাড়ির কাজ :

২) **ব্লুমের মূল্যায়ন অ্যাপ্রোচে (Bloom's Evaluation Approach)** : তিনি শিক্ষাদানকে বিষয়বস্তু অপেক্ষা উদ্দেশ্যভিত্তিক করার কথা বলেছেন। ব্লুমের মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার গঠন নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়ের নাম :—	বিষয় :—
শ্রেণি :—	একক :—
শিক্ষার্থীর সংখ্যা :—	উপএকক :—
গড় বয়স :—	আজকের পাঠ :—
শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম :—	
সময় :—	
তারিখ :—	

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ :—

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ
(ক) জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য	
(খ) বোধমূলক উদ্দেশ্য	
(গ) প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য	
(ঘ) মনোঃসঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য	

উপস্থাপন :

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণ	উদ্দেশ্য

মূল্যায়ন :

বাড়ির কাজ :

৩. **ধারনা-নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan on ICON Model)**

ধারনা-নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা একটি সম্ভাব্য Model প্রস্তাব করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়: — বিষয়: — পিরিয়ড়

শ্রেণি: — একক : —

শিক্ষক/শিক্ষিকা: — উপএকক: —

তারিখ: —

সময়: —

অদ্যকার পাঠ : —

কার্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য : —

স্মরণমূলক—
বোধমূলক—
প্রয়োগমূলক—
বিশ্লেষণমূলক—
মূল্যায়নমূলক—
সৃজনমূলক—
পূর্বজ্ঞান—
বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ—

শিখন কৌশল: —

ICON মডেল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারবে। তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর মূলভাব অবগত হতে পারে।

পর্যায় বা ধাপ	কাম্য সামর্থ্য অর্জনের ক্রম পর্যায়	শিক্ষকের ভূমিকা	প্রশ্ন/উদাহরণ
নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ (Observation)			
পূর্বসূত্র স্থাপন বা প্রাসঙ্গিকীকরণ (Contextnalisation)			

continued...

জ্ঞানগত শিক্ষানবীশি (Cognitive Apprenticeship)			
সহযোগিতা (Collaboration)			
ব্যাখ্যা ও নির্মিতি (Interpretation and Constrution)			
বহুমুখী ব্যাখ্যা (Multiple Interpretation)			
বহুমুখী উপস্থাপনা (Multiple Manifestation)			

কাজের পাতা

মূল্যায়ন

৮.৮ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত পাঠপরিকল্পনা (Lesson Plan on WBBPE)

নির্মিতিবাদ ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের পরিপেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের D.EL.Ed. পাঠ্যক্রমের ১৪-২-১৩ কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঠটীকার রূপরেখা নিম্ন রূপ :

বিদ্যালয়ের নাম: —	বিষয়: —
শ্রেণি: —	একক: —
শিক্ষার্থীর সংখ্যা: —	উপএকক: —
গত বয়স: —	
শিক্ষিকা নাম: —	
সময়: —	
তারিখ: —	

উদ্দেশ্য : —	(ক)	বিশেষ উদ্দেশ্য: —
	(খ)	সাধারণ উদ্দেশ্য: —

শিখন-শিক্ষন উপকরণ :	(i) শ্রেণির সাধারণ উপকরণ: —
	(ii) অন্যান্য উপকরণ: —

আয়োজন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া
শ্রেণিসজ্জা ও পূর্বজ্ঞান যাচাই					

উপস্থাপন স্তর / পরবর্তী উপস্থাপন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া

কর্মপত্র

প্রথম দল	দ্বিতীয় দল	তৃতীয় দল	চতুর্থ দল	পঞ্চম দল

৮.৯ সারসংক্ষেপ (Let us sum up) :

প্রাকটিস টিচিং-এর পরিবর্তে এখন আরও সংগতিপূর্ণ পরিবর্ত শব্দ ইনটার্নসিপ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকে সক্রিয়তাভিত্তিক করার পথে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। প্র্যাকটিস টিচিং ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত, ব্যবহারিক ও বাস্তবসম্মত করা যেখানে ট্রেনি টিচাররা (Trainee teacher) বিদ্যালয় পরিবেশে শ্রেণিকক্ষের বাস্তব পেক্ষাপটে দাড়িয়ে পাঠদানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে। এর দ্বারা প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন (Pre-Service Teacher Education) এ যেমন শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের আগে প্রয়োজনীয় পেশাগত অভিযুক্তিকরনের প্রস্তুতি হতে পারে। আবার ইন সার্ভিস টিচার এডুকেশন (In-Service Teacher Education) এ কর্মরত নিয়োজিত শিক্ষকেরা পেশাগত জ্ঞান, আগ্রহ এবং মনোভাব এমন উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয় যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষনের চরম উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষাগত ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া আরোও উন্নত হতে পারে।

৮.১০ অনুশীলনী (Unit End Exercise) :

১। শিক্ষক শিখনে প্র্যাকটিস টিচিং বা ইনটার্নশিপ বলতে আপনাদের ধারণা ব্যক্ত করুন।

২। PBTL এর উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করুন।

৩। আপনার নির্বাচিত যে কোন একটি বিষয় নির্বাচন করে PBTL অনুযায়ী একটি পাঠ পরিকল্পনা রূপায়ণ করুন।

ASSIGNMENT

Full Marks : 30

অ্যাসাইনমেন্টের ৫টি সেট (১, ২, ৩, ৪, ৫) নিচে দেওয়া হল। আপনাকে যে কোন একটি সেট দেওয়া হবে। সেই সেটের অ্যাসাইনমেন্টের এক কপি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামা দেবেন। উত্তরগুলি নিজের হাতে লিখবেন। ফটো কপি বা কম্পিউটারে তৈরী কোন লেখা ব্যবহার করবেন না।

প্রতিটি সেটের অ্যাসাইমেন্টের তিনটি ভাগ আছে (ক, খ ও গ)। প্রথম দুটি (অর্থাৎ ক, খ) উত্তর দেবেন ২৫০টি শব্দের মধ্যে এবং তৃতীয়টি (অর্থাৎ, গ) উত্তর দেবেন ৫০০ শব্দের মধ্যে। প্রথম দুটির প্রতিটির জন্য নির্ধারিত মূল্যবান ৭ এবং তৃতীয়টির জন্য মূল্যমান ১৬। একটি সেটের প্রতিটি প্রশ্নই আবশ্যিক।

সেট — ১

১। ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুকে সর্বাঙ্গিন বিকাশে সাহায্য করা। এই বিভিন্ন বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। ৭

২। খ) স্কিনারের মত অনুযায়ী কিভাবে বাঞ্ছিত আচরণ আয়ত্ত করা যায় এবং অবাঞ্ছিত আচরণ দূর করা যায় তা উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন। ৭

গ) প্রাথমিক স্তরে পাঠক্রমিক কার্যাবলী ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পর্কে কী জানেন বলুন? এই দুই প্রকার কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে বিবৃত করুন। ১৬

সেট — ২

১) ক) ব্রুণারের তত্ত্বে ধারণা গঠন কাকে বলে? তাঁর শিখন তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন। ৭

খ) সর্বান্তর্ভুক্তির পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? এই নীতি গ্রহণের কারণ কী? ৭

গ) শিক্ষণ দক্ষতা বলতে কি বোঝেন? শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ দক্ষতাগুলির ব্যবহার বিবৃত করুন। ১৬

সেট — ৩

১। ক) বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় ককুন। ৭

খ) শিক্ষণের দক্ষতা কয়প্রকার? যে কোন তিন প্রকার দক্ষতার উদাহরণসহ আলোচনা করুন। ৭

গ) সহযোগিতামূলক শিখন ও যৌথ শিখন সম্বন্ধে বিবৃত করুন। স্ব-শিখন কাকে বলে? স্ব-শিখনের উপযোগী দক্ষতা সম্বন্ধে বিবৃত করুন। কম্পিউটার সহযোগে শিখন সম্বন্ধে বর্ণনা করুন। ১৬

সেট — ৪

১) ক) স্কিমা কাকে বলে? পিঁয়াজের তত্ত্বে যে চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে সেগুলির বিবরণ দিন। শিখনের ক্ষেত্রে পিঁয়াজের তত্ত্বের গুরুত্ব কী? ৭

খ) মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আচরণ আলোচনা করুন। ৭

গ) সমস্ত শিশুর শিক্ষণ সর্বান্তর্ভূক্তি মূলক পরিবেশে প্রয়োজন কেন? প্রাথমিক স্তরে সর্বান্তর্ভূক্তি মূলক শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৬

সেট — ৫

ক) শিশুর প্রারোম্ভিক বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। ৭

খ) সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কী? বিদ্যালয়ের সময় সারণির ভিত্তি ও তৈরী করার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। ৭

গ) স্মৃতির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন এবং বিস্মৃতির কারণগুলি আলোচনা করুন। প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিস্মৃতি কমানোর জন্য শিক্ষকের করণীয় কী? ১৬